কাশীখণ্ড

শঙ্কু মহারাজ

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্র—শুভঙ্কর দে ও ধীরেন শাসমল
কাশীর ঘাটের ও অন্যান্য স্কেচ—পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বর্ণানুলেপ —পূর্ণেন্দু রায়

KASIKHANDA
A travelogue on Varanasi & Sarnath by Soneu Maharaj.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street Calcutta - 700 073

Price Rs 60/-

ISBN : 81-7293-152-2

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস সি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমার কাশীদর্শনের সঙ্গী

অপু

বাবু

বাবলা

ও

বাবলি-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

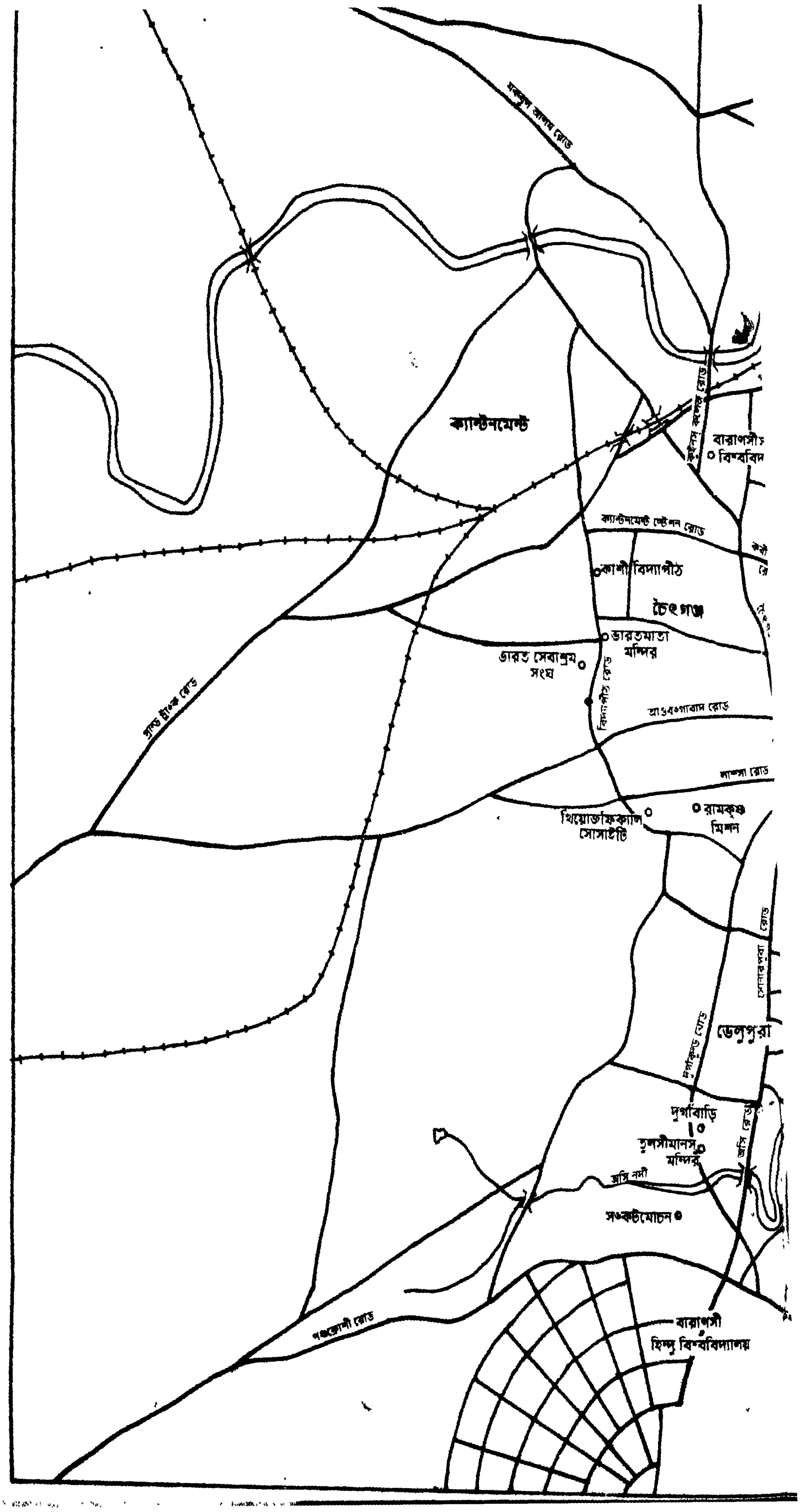
কেঁদুলীর মেলায়
গঙ্গাসাগর
চিত্রকূট
জয়ন্তী জুরিখ
তমসার তীরে তীরে
পঞ্চপ্রয়াগ
পঞ্চবটী
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
মানালীর মালঞ্চে
রমণীয়া রোম
রূপতীর্থ খাজুরাহো
লাদাখের পথে
হিমালয় (অম্‌নিবাস : তিন খণ্ড)

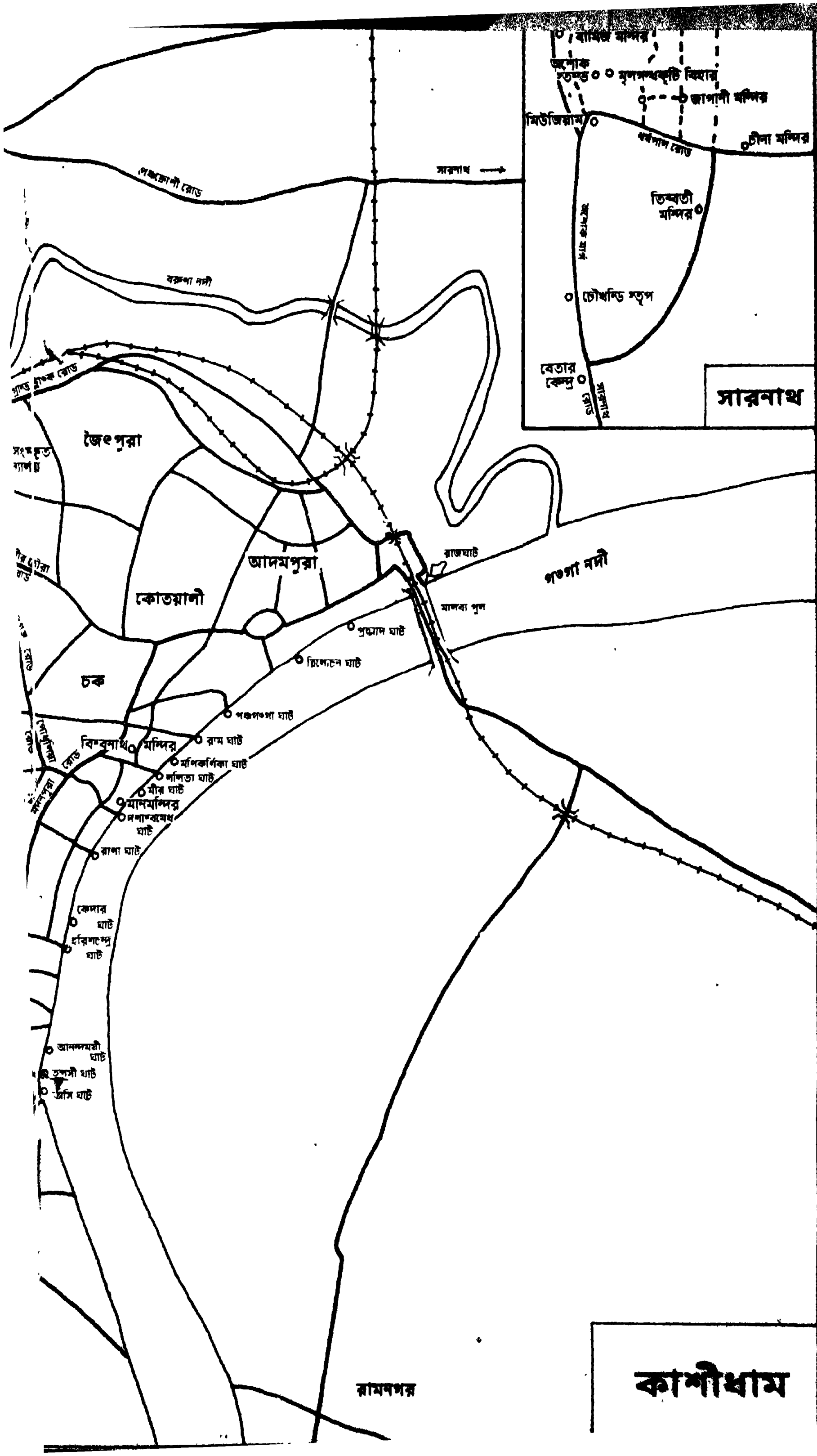
লেখকের আরও কয়েকখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ :

অমরতীর্থ অমরনাথ
অমরাবতী আসাম
এক ফরাসী নগরে
এবার বুঝি ভোলার বেলা হল
কুম্ভমেলায়
গঙ্গা যমুনার দেশে
চতুরঙ্গীর অঙ্গনে
দ্বারকা ও প্রভাসে
বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া
বৈষ্ণোদেবীর দরবারে
ব্রহ্মলোকে
ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গাপুরে
ভাঙা দেউলের দেবতা
মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্ব)
মায়াময় মেঘালয় (খাসি ও গারো পাহাড় পর্ব)
যদি গৌর না হ'ত
রাজভূমি রাজস্থান
লীলাভূমি লাহুল
সুন্দরের অভিসারে
সোনা সুরা ও সাকী
হিমতীর্থ হিমাচল

পরিচ্ছেদ পরিচিতি

দর্শনীয় স্থান ও মূল-বিষয়


মকবুল আলম রোড
ক্যান্টনমেন্ট
বারাণসী
বিশ্ববিদ
ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন রোড
কাশী বিদ্যাপীঠ
চৈৎগঞ্জ
ভারতমাতা
মন্দির
ভারত সেবাশ্রম
সংঘ
বিদ্যাপীঠ রোড
আওরংগাবাদ রোড
গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড
লাক্সা রোড
থিয়োজফিক্যাল
সোসাইটি
রামকৃষ্ণ
মিশন
ডেলুপুরা
দুর্গাকুণ্ড রোড
দুর্গাবাড়ি
তুলসীমানস
মন্দির
অসি নদী
সংকটমোচন
বারাণসী
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়



অশোক স্তম্ভ
মূলগন্ধকুটি বিহার
জাপানী মন্দির
মিউজিয়াম
ধর্মপাল রোড
চীনা মন্দির
তিব্বতী মন্দির
চৌখণ্ডি স্তূপ
বেতার কেন্দ্র
সারনাথ
সারনাথ
পঞ্চক্রোশী রোড
বরুণা নদী
জৈৎপুরা
আদমপুরা
কোতয়ালী
চক
রাজঘাট
গঙ্গা নদী
মালব্য পুল
প্রহ্লাদ ঘাট
ত্রিলোচন ঘাট
পঞ্চগঙ্গা ঘাট
রাম ঘাট
বিশ্বনাথ মন্দির
মণিকর্ণিকা ঘাট
ললিতা ঘাট
মীর ঘাট
মানমন্দির
দশাশ্বমেধ ঘাট
রাণা ঘাট
কেদার ঘাট
হরিশ্চন্দ্র ঘাট
আনন্দময়ী ঘাট
তুলসী ঘাট
অসি ঘাট
রামনগর
কাশীধাম

৪ দিন	**দ্বাদশ পরিচ্ছেদ** (পৃষ্ঠা ৯৫—১০৭)
	কাশী দর্শন—
	সঙ্কটা মন্দির, কালভৈরব মন্দির, ভারতমাতা মন্দির ও কাশী বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি।
	কাশীর নাম ও কাশীতে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পর্যটকের কথা।
	কাশীর ইতিহাস।
	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১০৮—১১২)
	কাশীখণ্ডের কয়েকটি কাহিনী।
৫ দিন	**চতুর্দশ পরিচ্ছেদ** (পৃষ্ঠা ১১৪—১২৩)
	বাবা বিশ্বনাথের পূজা।
	বিশ্বনাথ মন্দির এলাকায় অন্যান্য দর্শন।
	বিশ্বনাথ মন্দিরের ইতিহাস ও কাশীতে শিবলিঙ্গ।
	মা অন্নপূর্ণার পূজা।
	অন্নপূর্ণার কাহিনী ও মন্দিরের ইতিহাস।
	কাশীখণ্ডে অন্নপূর্ণা।
৬ দিন	**পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ** (পৃষ্ঠা ১২৪—১৩১)
	কাশী দর্শন—
	কপালমোচন ও কালভৈরবের কাহিনী, লাটরো (কুলস্তম্ভ) ও যোগাশ্রম।
	শিবালয় কাশী।
	ভারতের সাতটি মোক্ষক্ষেত্র।
	কাশীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালীর প্রভাব ও বঙ্গসংস্কৃতিতে কাশীর অবদান
৭ দিন	**ষোড়শ পরিচ্ছেদ** (পৃষ্ঠা ১৩২—১৪৫)
	বিন্ধ্যাচল ও চুনার।
	পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা।
	শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকা, শৃঙ্গেরী মঠ, শিবশিবা মন্দির, বৈদ্যনাথজীর মন্দির, বটুকভৈরব, কামাখ্যাদেবী, জয়নারায়ণ স্কুল (কলেজ), থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি ইত্যাদি।
	কাশীর উন্নয়নে কাশীনরেশ, মারাঠা ও বৃটিশদের অবদান।
	রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও অদ্বৈতমঠ।
	কাশীতে শ্রীমা (সারদাদেবী) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

৮ দিন **সপ্তদশ পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৪৬—১৫২)**

রামনগর (ব্যাসকাশী)।
কাশীর মেলা ও উৎসব।
কাশী সর্বধর্ম সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠ।

৯ দিন **অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৫৩—১৬২)**

কাশী দর্শন—
তুলসীদাসজীর কুঠিয়া এবং গুহা, চৈৎ সিংহের প্রাসাদ ও সঙ্কটমোচন।
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কথা।
কাশী সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি মন্তব্য।

১০ দিন **উনবিংশ পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৬৩—১৬৯)**

সারনাথ দর্শন—
বেনারস ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চল।
মহাভারতে কাশী।
সারনাথ নামের ইতিহাস।
বুদ্ধদেবের প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংঘ সৃষ্টির কথা।
জাতকের গল্প।

বিংশ পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৭০—১৮২)

সারনাথ দর্শন—
বুদ্ধদেব, সম্রাট অশোক এবং কুষাণ, গুপ্ত ও পালযুগের কথা।
প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কথা।
ফা-হিয়েন এবং য়ুয়ান চোয়াঙ।
চৌখণ্ডী স্তূপ, ধমেক স্তূপ, অশোক স্তম্ভ, মূলগন্ধকুটি বিহার,
জীনা মন্দির ও সংগ্রহশালা।
জাতকের গল্প।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

কাশীখণ্ড

সত্যযুগের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তবে তাব আগে একটু প্রস্তাবনার প্রয়োজন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ খ্রীঃ) ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী সুলেখক ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। সংস্কৃত ও ইংরেজীতে প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। খ্রীষ্টান আচার্য হবার পরেও তিনি সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন নি। তাঁর একখানি বাংলা সংকলনের নাম 'ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রধারা'। বইখানি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই সংকলনে চারখানি পৃথক গ্রন্থ রয়েছে—'ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রধারা', 'কাশী মাহাত্ম্য', 'পঞ্চবটী তত্ত্ব' এবং 'গীতাসভার প্রকাশিত পুস্তকাবলী'। বলা বাহুল্য আমার প্রস্তাবনা দ্বিতীয় গ্রন্থখানি অর্থাৎ 'কাশী মাহাত্ম্য'-কে নিয়ে। হুগলী জেলার বলাগড় নিবাসী জনৈক বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় গ্রন্থখানির প্রণেতা।

কাশীখণ্ডের মতানুসারে লিখিত এই কাশী মাহাত্ম্যের একটি কাহিনী '৺বীরেশ্বরের উপাখ্যান'। সত্যযুগের সেই কাহিনীটি দিয়েই আমি আজ বারাণসীব কথা শুরু করছি।

সেকালে অমিত্রজিৎ নামে জনৈক সাধুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি সাবাদিন হরিনাম কবতেন। তাঁর প্রজারাও ছিলেন ভারী হরিভক্ত।

একদিন দেবর্ষি নারদ হরিনাম করতে করতে সহসা তাঁর রাজসভায় এসে উপস্থিত। ভক্তরাজা দেবর্ষির চরণ বন্দনা কবে তাঁকে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন। তারপরে তাঁর আদেশ প্রার্থনা করলেন।

নারদ বললেন—মহারাজ, 'আমি এখন পাতাল থেকে আসছি। আসার পথে চম্পা নামে এক পুরীতে গিয়ে বড়ই বিস্মিত হয়েছি। কারণ ঐ পুরীর দ্বারে এক পরমাসুন্দবী যুবতী দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার মেয়ে?

সে উত্তর দিল, গন্ধর্বরাজ মণি আমার পিতা। আমার নাম মলয়গন্ধিনী। একদিন সকালে আমি একাকী রাজকাননে পুষ্পচয়ণ করছিলাম। সেইসময় কঙ্কালকেতু নামে একজন দৈত্য আমাকে জোর করে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। সে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। আমি তাকে বলেছি, এখন আমি একটি ব্রতপালন করছি। ব্রত শেষ হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমার কথা বিশ্বাস করে সে এখনো আমাকে ভোগ কবাব চেষ্টা করে নি। কিন্তু এভাবে তাকে বেশিদিন বিরত রাখতে পারব না। তাই আর অপেক্ষা না করে আমি একজন হরিভক্ত শক্তিমান পুরুষকে পতিত্বে বরণ করতে চাই। শুনেছি মর্ত্যে অমিত্রজিৎ নামে একজন সুদর্শন ও শক্তিশালী হরিভক্ত রাজা রয়েছেন। কৃপা করে আপনি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলুন, তিনি যেন অনুগ্রহ করে আমাকে এই পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

—কিন্তু কেমন করে? অভিভূত রাজা প্রশ্ন করেন।

নারদ উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, সেকথাও সে বলে দিয়েছে। আগামী পূর্ণিমার রাতে আপনি সাগরতীরে যাবেন। সেখানে একখানি নৌকায় স্বয়ং জগন্মাতাকে দেখতে পাবেন। তিনি আপনাকে পাতালে নিয়ে যাবেন।

দেবর্ষির পরামর্শ অনুযায়ী অমিত্রজিৎ যথাসময়ে যথাস্থানে এসে জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করলেন। রাজাকে তিনি নিমেষের মধ্যে পাতালে চম্পাপুরীর দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

পুরীতে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ চলার পরে রাজা সোনার পালঙ্কে পরমাসুন্দরী মলয়গন্ধিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন। এদিকে অমিত্রজিৎকে দেখে রাজকন্যাও মোহিতা। পুলকের প্রথম আবেশ কেটে যাবার পরেই যুবক-যুবতী ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।

কিছুক্ষণ মিলনসুখ উপভোগ করার পরে রাজকন্যা জানালেন—কঙ্কালকেতুর ফিরে আসার সময় হয়ে গেল। চলো, তোমাকে এখন অস্ত্রাগারে লুকিয়ে রেখে আসি। কঙ্কালকেতুর কাছে সর্বদা একটা ত্রিশূল থাকে। সেটা দিয়েই বধ করতে হবে তাকে। সে ফিরে এসে বিশ্রাম নেবে। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি ত্রিশূলটা তোমাকে দিয়ে আসব।

অমিত্রজিৎকে অস্ত্রাগারে রেখে আসার একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে দৈত্যরাজ কঙ্কালকেতু চম্পাপুরীতে ফিরে এলেন। পালঙ্কের পাশে হাতের ত্রিশূলটা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করলেন—সুন্দরী! ব্রত শেষ করতে তোমার আর কতদিন লাগবে? আমি যে আর ধৈর্যধারণ করতে পারছি না। তবু আমি তোমার অনুগত দাস। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তুমি আমার প্রতি সদয়া হও। বলো, কবে তুমি আমার হবে? সেদিন থেকে আমি দেবকন্যা ও ঋষিকন্যাদের এনে তোমার সেবায় নিযুক্ত করব।

মলয়গন্ধিনী মৃদু হেসে সলাজ স্বরে উত্তর দিলেন—দৈত্যবর, পরশু আমার ব্রত শেষ হবে। তারপরেই আমি আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করব।

রাজকুমারীর প্রতিশ্রুতি পেয়ে দৈত্যরাজ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন। এবং ক্লান্ত কঙ্কালকেতু একটু বাদেই সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

দৈত্যরাজের নাসিকাগর্জন কানে আসতেই মলয়গন্ধিনী পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লেন। ত্রিশূলটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অমিত্রজিতের কাছে। তাঁর হাতে ত্রিশূলটা দিয়ে বললেন—এখুনি আমার সঙ্গে এসে দৈত্যকে বধ করো। আমাকে মুক্ত করে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!

ত্রিশূল হাতে রাজা এসে দাঁড়ালেন পালঙ্কের পাশে। নিদ্রিত শত্রুকে বধ করা উচিত নয় বলে তিনি দৈত্যের পিঠে লাথি মারলেন।

ঘুম ভেঙে গেল কঙ্কালকেতুর। তিনি চোখ মেলে দেখতে পেলেন, তাঁরই ত্রিশূল হাতে সামনে আরেকজন যুবক। তাঁর পাশে মলয়গন্ধিনী।

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তিনি। পালঙ্ক থেকে নেমে আসেন নিচে। তারপরে রাজকুমারীকে বলেন—আমি তো তোমার ওপরে কোন অত্যাচার করি নি! ভালোবেসে তোমাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে। তারপর থেকে প্রাণপণে তোমার সেবা করে

আসছি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি। অথচ তুমি এভাবে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যোগী হয়েছো! এ কি উচিত হচ্ছে তোমার?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না রাজকুমারী। তবু তিনি ইশারায় অমিত্রজিৎকে আঘাত করতে বলেন।

অমিত্রজিতের দিকে তাকিয়ে তখন দৈত্যরাজ বললেন—মহাশয়, আপনার মতো আমিও এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এখানে একে নিয়ে এসেছি। এতদিন দাসানুদাসের মতো এর সেবা করে আসছি। এত করেও এই ছলনাময়ীর মন পেলাম না আমি। আপনিও পাবেন না। তাই আপনাকে বলি, নারীকে বিশ্বাস করবেন না। এদের মুখে অমৃত কিন্তু অন্তরে হলাহল। এরা যখন যার কাছে আশ্রয় পায়, তখন তার মনোরঞ্জন করে। আবার সুযোগ পেলেই তাকে আঘাত করে।

কিন্তু রূপমুগ্ধ রাজা দৈত্যের উপদেশ অমান্য করে তাঁরই ত্রিশূল দিয়ে তাঁকে হত্যা করলেন। তারপরে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করে তাঁকে নিয়ে আপন প্রাসাদে ফিরে এলেন।

যথাময়ে মলয়গন্ধিনী সন্তানার্থিনী হলেন। অমিত্রজিৎ তাঁকে মহামায়ার মহাপূজায় ব্রতী হতে বললেন।

কয়েকদিন পুজো করার পরে একদিন মহামায়া তাঁকে দর্শন দান করলেন। বললেন—কি তোমার প্রার্থনা?

রাণী করজোড়ে প্রার্থনা করলেন— মহারাজের ঔরসে আমার গর্ভে বিষ্ণুর অংশ নিয়ে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করুক। সেই পুত্র যেন জন্মের পরেই স্বর্গ দর্শন করতে চলে যায় এবং তারপরেই ষোল বছর বয়স লাভ করে আবার আমার কাছে ফিরে আসে।

যথাসময়ে রাণীর একটি ছেলে হল। কিন্তু জ্যোতিষীগণ রাজাকে জানালেন—মহারাজ, আপনার এই ছেলে গণ্ড লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছে। একে প্রাসাদে রাখলে আপনার জীবন নাশ হবে।

কথাটা কানে আসতেই রাণী একজন ধাত্রীকে আদেশ দিলেন—এখুনি এই ছেলেকে বিকটা দুর্গাদেবীর কাছে দিয়ে আয়!

ধাত্রী শিশুটিকে নিয়ে সেখানে এলো। বিকটা শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে জনৈকা যোগিনীকে বললেন—একে নিয়ে একবার স্বর্গে যাও। স্বর্গ দেখিয়ে আবার একে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

ফিরে আসার পরেই বিকটা শিশুটিকে পীঠে সংস্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুধের শিশু ষোল বছরের কিশোর বালক হয়ে গেল। কিন্তু বিকটাদেবী তাকে পিতৃপরিচয় জানালেন না।

বাপ-মায়ের খোঁজ করতে করতে অবশেষে সেই বালক নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কাশীধামে এলো। পিতৃপরিচয় পাবার আশায় সে জীবের পরমগতি বিশ্বনাথের আরাধনা শুরু করল। করুণাময় বিশ্বনাথ তুষ্ট হলেন। কিশোর তপস্বীর সামনে আবির্ভূত হয়ে তিনি বললেন—তোমার তপস্যায় প্রীত হয়েছি আমি। আজ থেকে তোমার নাম হল বীর আর আমার নাম বীরেশ্বর। রাজা অমিত্রজিৎ তোমার পিতা এবং রাণী মলয়গন্ধিনী তোমার মাতা। তুমি তাঁদের কাছে চলে যাও। তাঁরা তোমাকে পেয়ে খুশি হবেন।

আরেকটা কথা, আমি এখুনি তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গে প্রবেশ করছি। তারপরেই এর নাম হবে বীরেশ্বর শিবলিঙ্গ। অপুত্রকগণ এই লিঙ্গমূর্তির আরাধনা করলে পুত্রলাভ করবেন।

মোক্ষক্ষেত্র শিবপুরী বারাণসীধামে বীরেশ্বর শিবলিঙ্গ অবশ্যই অব্যয় ও অক্ষয় হয়ে চিববিরাজ করছেন। কিন্তু সে সংবাদ আমার প্রপিতামহের পিতৃদেব স্বর্গীয় গঙ্গাধর ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়েছিল কিনা জানা নেই আমার। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বীরেশ্বরের প্রসাদ লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে বারাণসী প্রসঙ্গে সত্যযুগের কাহিনীটি শেষ হয়েছে আমার। এবারে আমি ত্রেতা ও দ্বাপরের সব কথা বাদ দিয়ে একেবারে কলিযুগে উপনীত হতে চাই।

সে কলিযুগ কিন্তু বিংশ শতাব্দী নয়, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক। আমার প্রপিতামহেব পিতৃদেব গঙ্গাধর তখন প্রবল প্রতাপে জমিদারী চালাচ্ছেন। তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। কারণ তিনি অপুত্রক। বিবাহের পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। তাঁর স্ত্রী তিনটি কন্যারও জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু তিনি গঙ্গাধরকে পুত্র উপহার দিতে পারেন নি। আত্মীয়রা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পত্নীপ্রিয় গঙ্গাধর সে পরামর্শ মেনে নিতে পারলেন না। পরিবর্তে তিনি পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞ করালেন। কোববেজ পীর ও জ্যোতিষীদের কথামত কাজ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই বৃথা হল। ফলে বংশ লুপ্ত হবার আশঙ্কায় গঙ্গাধর খুবই ভেঙে পড়লেন।

এইসময়ে এক জ্ঞাতিভাই তাঁকে সস্ত্রীক বারাণসী যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন—বারাণসী গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের কাছে পুত্রভিক্ষা করো, করুণাময় বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

কাজটা কোনমতেই সহজসাধ্য নয়। কারণ ঘটনাটি শ'দেড়েক বছর আগেকার। তখনকার দিনে ববিশাল জেলার গাভা গ্রাম থেকে বারাণসী যাওয়া যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি কষ্টকব ও বিপদসঙ্কুল।

কষ্ট ও বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে গঙ্গাধর পরামর্শটা মেনে নিলেন। খাবার-দাবার ওষুধ-পথ্য পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে দিনক্ষণ দেখে গাভার খালে বজরা ভাসালেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বজবা চলল এগিয়ে। কালিজিরা, কীর্তন-খোলা, পদ্মা ও গঙ্গা বেয়ে বজরা একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে নোঙর করল।

দুর্ভাগ্য আমার, গঙ্গাধর তাঁর এই সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জলযাত্রার রোজনামচা রেখে যান নি। রেখে গেলে বোধ করি সেখানি অবলম্বনে একখানি রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী লিখে ফেলতে পারতাম।

এ ব্যাপারে অবশ্য গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা উচিত হবে না। কারণ এতকষ্টে বংশরক্ষা করার পরে যে তাঁরই প্রপৌত্রের পুত্রকে ভ্রমণকাহিনী লিখে পেটের ভাত যোগাড় করতে হবে, একথা সেই ডাকসাইটে জমিদার নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেন নি।

কিন্তু আমার কথা পরে হবে, আগে গঙ্গাধরের কথা শেষ করে নিই। অবশেষে

তাঁর বজরা একদিন কাশীর ঘাটে এসে ভিড়ল। গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাধর সস্ত্রীক বিশ্বনাথ মন্দিরে গেলেন। ফুল ও বেলপাতায় আবরিত বাবা বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্তি দর্শন করলেন, স্পর্শ করলেন, পুজো দিলেন, প্রণাম করলেন। দুজনে বার বার বাবা বিশ্বনাথের কাছে কায়মনোবাক্যে পুত্রভিক্ষা করলেন। অবশেষে অঙ্গীকার করলেন—আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হলে আমরা আর বাড়ি ফিরে যাবো না। তোমার শ্রীচরণেই দেহপাত করব।

গঙ্গাধর সস্ত্রীক কাশীবাস করতে থাকলেন। প্রতিদিন প্রত্যুষে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানের পরে জলগ্রহণ না করে বিশ্বনাথ মন্দিরে যেতেন। সারাদিন সেখানে বসে থাকতেন আর বাবার কাছে পুত্রভিক্ষা করতেন। সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরে সিদ্ধভাত ফুটিয়ে জঠরাগ্নির জ্বালা মেটাতেন।

এই কাহিনী আমি শুনেছি আমার ছোটঠাকুর্দা স্বর্গীয় রোহিতেশ্বর ঘোষ দস্তিদারের কাছে। তিনি কিন্তু তাঁর বিবরণে কখনও বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের উল্লেখ করেন নি। ঠিকই করেছেন। কারণ বীরেশ্বর তো বিশ্বনাথ থেকে পৃথক কিছু নয়। তাঁর কৃপালাভ করতে পারলেই বীরেশ্বরের কৃপালাভ হয়ে যায়।

তাই হয়েছিল গঙ্গাধরের। ফলে তাঁদের খুব বেশিদিন কাশীবাস করতে হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বনাথ গঙ্গাধরের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমার পিতামহের পিতামহী সন্তানসম্ভবা হলেন এবং সেইসঙ্গে গঙ্গাধরের স্থির বিশ্বাস হল যে এবারে আর কন্যা নয়, তিনি অবশ্যই পুত্রলাভ করবেন। বলা বাহুল্য সে বিশ্বাস মিথ্যে হয় নি।

পুজো-পার্বণ ও দানধ্যানের পালা সাঙ্গ করে সশ্রদ্ধ চিত্তে ও পুলকিত অন্তরে গঙ্গাধর আবার বজরা ভাসালেন। বারাণসী থেকে বরিশাল ফিরে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই আমার পিতামহের পিতৃদেব। গঙ্গাধরের একমাত্র পুত্র এবং আমাদের বংশরক্ষক। বিশ্বনাথের বরপুত্র বলে গঙ্গাধর তাঁর নাম রাখলেন বিশ্বেশ্বর।

সেদিন বাবা বিশ্বনাথ গঙ্গাধরের প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন বলেই আমি এই সুন্দর ভুবনে চোখ মেলতে পেরেছি। আর আশ্চর্য, এতকাল পরে তিনি বিশ্বেশ্বরের এই তুচ্ছ প্রপৌত্রের প্রতিও সমান করুণাময়।.....

কিন্তু আমার কথা শুরু করার আগে বলে নেওয়া ভাল যে ঊনবিংশ শতকের কথা এখানেই শেষ হল। এবারে আমি বিংশ শতাব্দী অর্থাৎ আমার কথায় আসছি।

কাশীর প্রতি আমার আকর্ষণ আশৈশব। শৈশবে অবশ্য যাবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় স্থায়ী হবার কয়েক বছর পর থেকেই আমার কাশী ভ্রমণ শুরু হয়েছে। আমি নানা কারণে বারাণসী গিয়েছি। কখনও ব্যবসার প্রয়োজনে, কখনও হনিমুন করতে, কখনও সাহিত্য সম্মেলনে, কখনও দুর্গাপূজা দেখতে, কখনও বা শুধুই বেড়াতে। বলা বাহুল্য প্রতিবারেই আমি বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়েছি, পুজো দিয়েছি। কিন্তু তিরিশ বছরে বার দশেক কাশী গিয়েও কাশীশ্বরের কাছে কামনা করি নি কিছু। কি চাইব? তিনি যে না চাইতেই আমাকে সব দিয়েছেন। তবে প্রায় প্রতিবারেই দেখেছি কাশী থেকে ফিরে এসে আমার কিছু ভাল হয়েছে। তাই দিন দিন বিশ্বনাথের ওপর আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস

বেড়েই গিয়েছে।

অবশেষে গঙ্গাধরের মতো আমার জীবনেও ঘটে গেল এক প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। দীর্ঘ দেড়শ' বছর বাদেও বিশ্বনাথ বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আজও আমাদের পরিবারের প্রতি সমান করুণাময়।

বাংলা তেরোশ' অষ্টাশি সাল। ভারত সেবাশ্রমের পূজনীয় শ্রীদিলীপ মহারাজের আমন্ত্রণে দুর্গাপূজা দেখতে কাশী গিয়েছি। সেটি সম্ভবত আমার সপ্তমবার কাশী দর্শন।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিবছর খুবই সমারোহের সঙ্গে কাশীতে দুর্গাপূজা সুসম্পন্ন করেন। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসীবৃন্দ ঐসময়ে কাশীকেন্দ্রে সমবেত হন। তাঁদের সঙ্গলাভের আশায় আমি আবার কাশী গেলাম।

তবে অনিবার্য কারণে উঠতে হল রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউসে। সেখানে আলাপ হল মিশনের সম্পাদক সত্যেন মহারাজ আর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত মঠের স্বামী অচ্যুতানন্দজী বা আলোক মহারাজের সঙ্গে। প্রতিদিন প্রত্যুষে অচ্যুতানন্দজীর সঙ্গে কাশী দর্শনে বের হই, ঘুরে বেড়াই মন্দিরে মন্দিরে আর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে।

কাশী পরিক্রমার পরে গঙ্গাস্নান সেরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে চলে আসি। সারাদিন সেখানে থাকি। পুজো দেখি, প্রসাদ পাই।

অবশেষে পুজো শেষ হয়ে যায়, আসে বিজয়া দশমী। সেদিন সন্ধ্যায় আলোর মালায় সাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে সংঘের মাতৃমূর্তি দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। আরতি ও নৌকাবিহারের পরে মৃন্ময়মূর্তি গঙ্গাবক্ষে বিলীন হয়ে যান। মা বিদায় নেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভক্তবৃন্দ ফিরে আসেন আশ্রমে।

আমরাও তাই এলাম। আর তার পরদিনই আমাদের কলকাতায় ফিরে আসার দিনটি এসে গেল। মনটা ভারী হয়ে উঠল। তবু সেদিন ভোরে আলোক মহারাজের সঙ্গে কাশী পরিক্রমায় বের হলাম। কয়েকটি মন্দির ও ঘাট দর্শন করে অবশেষে গেলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে। বার বার মনে পড়তে থাকল কাশীর কথা আর আমাদের পরিবারের প্রতি কাশীশ্বরের অকৃপণ করুণার কথা।

কেন জানি না, কোনদিন যা করি নি, সেদিন তাই করে ফেললাম। বিশ্বনাথকে প্রণাম করার সময়ে মনে মনে বলে ফেললাম—বাবা, তুমি তো না চাইতেই আমাকে সবকিছু দিয়েছ! তোমার আশীর্বাদে আমি শিবালয় হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে আর সমতল ভারতের পথে-প্রান্তরে প্রচুর পদপরিক্রমার সুযোগ লাভ করেছি। তোমার করুণায় আমি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছি। সত্যি বলতে কি আমার আর চাইবার মতো কিছু থাকতে পারে না। তবু আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিবেদন করতে এসেছি ঠাকুর আমি একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করতে চাই। তুমি আমার এই আশা সফল করো!

হ্যাঁ, বাবা বিশ্বনাথ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু সেকথা বলার আগে আমার প্রতি তাঁর আরেকটি অযাজিত করুণার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রার্থনা জানিয়ে সেবারের মতো বাবাকে শেষ প্রণাম করে ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। স্নান-খাওয়া সেরে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি

কাশীর কথা, কাশীশ্বরের সীমাহীন করুণার কথা।

আমাদের গাড়ি বিকেলে, অমৃতসর মেল। সকালে হাওড়া পৌঁছবে। পুজোর ছুটির পরে আগামীকালই কলকাতার অধিকাংশ অফিস খুলছে। গাড়িতে বেশ ভিড় হবে। হোক্ গে, তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না। আমাদের রিজার্ভেশন রয়েছে।

তখন বোধ করি বেলা দেড়টা। সহসা কেউ দরজায় কড়া নাড়ে।

—কে?

—ভেতরে আসতে পারি? কোমল নারীকণ্ঠ।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। বলি—আসুন, দরজা খোলা আছে।

দুটি যুবতী ঘরে ঢোকে। একটি রোগা ও ছোটখাটো বাঙালী মেয়ে, অপরটি লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী শ্বেতাঙ্গিনী। মুখখানি মিষ্টি। মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল। পোশাকটি সাধারণ ও ভদ্র। বয়স বোধ করি বছর পঁচিশেক (পরে জেনেছি তখন তার তেত্রিশ চলছিল, নিয়মিত যোগব্যায়াম করার জন্য এত কম মনে হয়)।

ওদের বসতে বলি। বসার পরে বাঙালী মেয়েটি বলে — আমার নাম মিতা রায়চৌধুরী, আর এর নাম গাব্রিয়েল রিফ্স্থাল। আমি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করি। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক সত্যেন মহারাজ আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিখানি হাতে নিই। স্বামীজী লিখেছেন—এই ফরাসী মেয়েটি পারি মহানগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত গ্রেজ বেদান্তিক রামকৃষ্ণ সেন্টারের একজন অনুগত ভক্ত। সেন্টারের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী রিতজানন্দ মহারাজের স্নেহধন্যা। মেয়েটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশ দেখতে এসেছে। তিন সপ্তাহ কাশীতে কাটিয়ে এখন কলকাতায় যেতে চাইছে। সে জয়রামবাটি কামারপুকুর দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়মঠ দর্শন করতে চায়। শুনলাম আপনারা আজ কলকাতা রওনা হচ্ছেন। একে যদি একটু সঙ্গে নিয়ে যান...

সঙ্গে নেওয়া সহজ নয়। কারণ আগেই বলেছি, পুজোর ছুটির পর আগামীকাল অধিকাংশ অফিস খুলবে। গাড়িতে ভিড় হবে, মেয়েটির রিজার্ভেশন নেই। তবু আপত্তি করতে পারি না। একে বিদেশিনী, তার ওপরে বিবেকানন্দের দেশ দেখতে এসেছে।

আমি সম্মত হওয়ায় খুশি হয় গাব্রিয়েল। সে সানন্দে নিজের পরিচয় দেয়—আমি ফ্রান্সের স্ত্রাসবুর্গ শহরে থাকি। একটা সরকারী হাসপাতালে সেবিকার কাজ করি। তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। শুধু তোমার সঙ্গে যাবো।

গাব্রিয়েল দেখছি বেশ পরিষ্কার ইংরেজী বলে। মন্দের ভাল। বিনা রিজার্ভেশানে ভিড়ের গাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এর ওপরে আবার যদি ভাষা-বিভ্রাট ঘটত, তাহলে বিপদ বাড়ত।

আমার আশঙ্কা কিন্তু সত্য হল না। গাড়ি ছাড়ার পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পেলাম আমাদের পাশে একটি বার্থের যাত্রী কোন কারণে আসতে পারেন নি। এবং টিকেটচেকারকে অনুরোধ করতেই তিনি সেই বার্থখানি গাব্রিয়েলের নামে রিজার্ভ করে দিলেন। আর এই অসাধারণ উদারতার জন্য চেকার কোন পারিশ্রমিক দাবী করলেন না। শুয়ে-বসে খেয়ে-দেয়ে বহাল তবিয়তে গাব্রিয়েল আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দর কলকাতায় পদার্পণ করল।

আমি ওকে একটা হোটেল ঠিক করে দিলাম। আমার সঙ্গে অথবা আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সে জয়রামবাটি কামারপুকুর দক্ষিণেশ্বর বরানগর ও বেলুড়মঠসহ কলকাতার যাবতীয় দ্রষ্টব্যস্থল দর্শন করল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যায় ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। পুজো দেখে ও প্রসাদ পেয়ে সে ভারী খুশি হল। আর তার পর থেকেই সে আমাকে 'ব্রাদার' ডাকতে শুরু করে দিল। আমরা ভাই-বোন হয়ে গেলাম।

অবশেষে বিদায় দেবার দিনটি সমাগত হল। রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিতে আমি ওকে নিয়ে হাওড়ায় গেলাম। দিল্লী থেকে ওর বিমান। গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে গাব্রিয়েল আমার একখানি হাত ধরে সহসা বলে উঠল—স্ত্রাসবুর্গে আমার ফ্ল্যাটের দরজা তোমার জন্য খোলা রইল। একবার ফ্রান্সে চলে এসো।

—আমি গরীব দেশের একজন নগণ্য লেখক। আমি কেমন করে য়ুরোপ যাবো!

—দেখো, কাশীতে প্রথম দেখা হয়েছে আমাদের। তুমিই তো বলেছো বিশ্বনাথ তোমাদের পরিবারের প্রতি সর্বদা সদয়। তাঁর দয়াতেই তুমি চলে আসবে আমার কাছে।

ঠিকই বলেছিল গাব্রিয়েল। কাশী থেকে সেবারে ফিরে আসার পরে মাত্র সাত মাসের মধ্যেই বাবা বিশ্বনাথ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমি সত্যই একদিন সকালে জুরিখের ক্লোটেন বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম।

কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ যাঁর মাধ্যমে আমার প্রার্থনাটি পূর্ণ করিয়েছেন, তাঁর কথা না বললে যে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তাঁর নাম শ্রীভগবতী প্রসাদ খৈতান। ভারতবিখ্যাত সলিসিটার্স মেসার্স খৈতান অ্যাণ্ড কম্প্যানীর সিনিয়ার পার্টনার এবং কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সামজসেবী। পাঁচ পুরুষ ধরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। চমৎকার বাংলা বলেন এবং সুন্দর লিখতে-পড়তে জানেন। তিনি আমার ভ্রমণকাহিনী পড়তে ভালোবাসেন। আমার এই স্নেহপ্রবণ প্রবীণ পাঠককে আমি 'বাবুজি' বলি। আর তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

গাব্রিয়েল চলে যাবার প্রায় মাস পাঁচেক পরে একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে ফোন করলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি তাঁর অফিসে এলাম। আমাকে বিস্মিত করে তিনি বলে বসলেন—আমার পরিচিত এডুকেশান ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে আমি তোমার 'রাজভূমি রাজস্থান' বইখানি পড়তে দিয়েছিলাম। বইখানি ভাল লেগেছে তার। গতকাল শুনতে পেলাম, ওরা এবারে একজন লেখক অথবা শিল্পীকে য়ুরোপ ভ্রমণের জন্য একটা স্কলারশিপ দিচ্ছে। তুমি কালই একটা দরখাস্ত আমাকে দাও। দেখি স্কলারশিপটা তোমাকে পাইয়ে দেওয়া যায় কিনা?*

এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে? আমি তো বাবুজির কাছে কখনও য়ুরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করি নি। কথাটি কেবল বলেছি বাবা বিশ্বনাথকে এবং তাও মনে মনে।

বলা বাহুল্য বাবুজির সুপারিশ ব্যর্থ হয় নি। এবং গাব্রিয়েল বিদায় নেবার আট মাসের মধ্যে আমি সুইজারল্যাণ্ড ও গ্রেটবৃটেন ভ্রমণ সেরে একদিন দুপুরে সত্যই পারির শার্ল-দ্য-গল বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। কাস্টমস সেরে লাউঞ্জে বেরিয়ে

দেখি আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফ্‌স্থাল আমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে দাঁড়িয়ে।

প্রায় ছুটে এসে আমার একখানি হাত ধরে সে। তারপরে সবজান্তার স্বরে বলে ওঠে—কি, আমি তোমাকে বলে এসেছিলাম না? কাশীতে প্রথম দেখা হয়েছে আমাদের। বিশ্বনাথের দয়াতেই তুমি চলে আসবে আমার কাছে!

আমি মৃদু হেসে মাথা নেড়েছি। আর মনে মনে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে পুনরায় সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করেছি।

এখানেই শেষ নয়। এর দু-বছর বাদে আমি আবার য়ুরোপে গিয়েছি। আর সেবারে বিমান-টিকিটের ব্যবস্থা করেছে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল। কিন্তু সে-ও যে আমার কাছে বাবা বিশ্বনাথেরই দান।*

আর তাই বলি মোক্ষক্ষেত্র শিবপুরী বারাণসী যুগে যুগে আমাদের কৃপা করে চলেছেন। তাঁকে প্রণাম, শত সহস্র প্রণাম।

* লেখকের 'জয়ন্তী জুরিখ' ও 'এক ফরাসী নগরে' বই দু'খানি দ্রষ্টব্য।

॥ দুই ॥

ভাবতে ভাল লাগছে, আজ আমি আবার কাশী এসেছি। তবে এবারে কিন্তু আসার কোন কথাই ছিল না। কেমন করেই বা থাকবে? এই তো জানুয়ারীতে বিশ্বনাথ দর্শন করে গেলাম। আর এখন অক্টোবর চলেছে।

তবু সুধাংশু মানে দে'জ পাবলিশার্সের সুধাংশুশেখর দে সেদিন কথায় কথায় যখন কাশী আসার আমন্ত্রণ জানালো আপত্তি করতে পারলাম না। বরং ভাবলাম, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় যখন আরেকবার কাশী যাবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেটির সদ্ব্যবহার করাই উচিত।

তাই আজ আমি আবার কাশীতে, এবং এবারে একা নই। আমার সঙ্গে বেশ বড় দল। সুধাংশুরা তিনজন — সুধাংশু, তার স্ত্রী টুকু ও ছেলে অপু, ক্লাশ নাইনে পড়ে। সুধাংশুর বন্ধু ও আত্মীয় মনোরঞ্জনরাও তাই। মনোরঞ্জন, তার স্ত্রী অর্চনা ও ছেলে বাবু, ক্লাশ সিক্‌সে পড়ে। সুধাংশুর অপর বন্ধু শিল্পী ধীরেন শাসমল এসেছে তার স্ত্রী অঞ্জু, মেয়ে বাবলি ও ছেলে বাবলাকে নিয়ে। বাবলি ও বাবলা সিক্‌স এবং ফোর-এ পড়ে। অতএব আমার সঙ্গে বেশ বড় দল। আমাকে নিয়ে এগারোজন। একটা ফুটবল টীম।

যথারীতি গাড়ি লেট ছিল। তাই ভারত সেবাশ্রম সংঘে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় একটা। স্বামী সদাশিবানন্দজী মহারাজ গতকাল দুপুরে আমার চিঠি পেয়েছেন। তবু তিনি আমাদের জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। যাত্রীনিবাসের দোতলায় বাথরুমযুক্ত চারখানি ডাব্‌ল-বেডরুম ও প্রসাদের ব্যবস্থা। প্রসাদ মানে রীতিমত ভুরিভোজ। ফল দিয়ে শুরু ও মিষ্টান্ন দিয়ে শেষ, মাঝখানে ভাত ডাল সুক্তো সবজি ছানার ডালনা ও টক। খিদের পেটে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল। আর না হয়েই বা উপায় কী? স্বামীজি ও সুধাংশু মহারাজ সামনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ তদারকি করলেন। সুধাংশু মহারাজ ভারত সেবাশ্রমের জনৈক সেবাপরায়ণ সুদর্শন ও যুবক ব্রহ্মচারী।

প্রসাদের পরে ঘরে এসে তাই বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হল। বিশ্রাম মানে ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা। তারপরে সন্ধ্যা নাগাদ রিক্সায় রওনা হলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে।

কাশী এসে ধুলোপায়ে বিশ্বনাথ দর্শন করতে হয়। কিন্তু গাড়ি লেট হওয়ায় তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। না হোক্ গে। এখন তো বাবা বিশ্বনাথের কাছে চলেছি।

আমি আর সুধাংশু এক রিক্সায় উঠেছি। জনবহুল পথ পেরিয়ে সাইকেল-রিক্সা চলেছে এগিয়ে। কথায় কথায় সুধাংশু বলে— আমি আর কখনও কোনো আশ্রমে উঠি নি। এখানকার ভারত সেবাশ্রম সংঘ দেখে ভারী আনন্দ পেলাম। যেমন সুন্দর থাকা-খাবার ব্যবস্থা, তেমনি সেবা-যত্ন। আর এখানে তো দেখছি, সারাদিন ধরেই যাত্রী আসছেন!

আমি মাথা নাড়ি।

সুধাংশু আবার বলে— আসার সময় দেখলাম, দশ/বারোজনের একটা দল এলো। স্বামীজি হাতজোড় করে জানালেন, আর কোনো ঘর খালি নেই। তবু তাঁরা আশ্রয়ের জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন। অবশেষে বললেন, বেশ আমরা অফিসঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকব। স্বামীজি সম্মত হলেন। তাঁরা সেখানে বেশ গুছিয়ে বসেছেন।

আমি বলি — রাতে ফিরে দেখবে, এমন আরও কয়েকটি দল এসে গেছেন এবং মন্দিরের বারান্দা থেকে বাইরের বসবার ছাউনি পর্যন্ত সমস্ত জায়গা যাত্রীতে বোঝাই হয়ে গিয়েছে।

—এই যেখানে অবস্থা, সেখানে হোটেলে থাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের চারখানি ঘর দখল করে রাখা নিতান্তই অন্যায়।

হেসে বলি — চারখানি ঘর ছেড়ে দিলেও কিন্তু যাত্রীদের সমস্যা মিটবে না।

—তা জানি। তবু আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। একটু থামে সুধাংশু। তারপরে বলে — তাই চলুন, দেখা যাক, একটা মোটামুটি ভাল হোটেলে খানচারেক ঘর পাওয়া যায় কিনা? পেলে একেবারে 'বুক' করে নেব, স্বামীজিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাল সেখানে চলে আসব।

বুঝতে পারি ওর বিবেকদংশন শুরু হয়েছে। সুতরাং হোটেল দেখতেই হবে আর এ ব্যাপারে মিতা আমাদের সাহায্য করতে পারে। মিতা মানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিতা রায়চৌধুরী, যে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফ্স্থালকে প্রথম আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। এখন সে-ও আমার ভগ্নীসমা। তারপরে যতবার কাশী এসেছি, মিতা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সে রামাপুরায় থাকে, রামকৃষ্ণ মিশনের ঠিক পেছনে।

অতএব মনোরঞ্জনকে বলি—তোমরা সোজা গোধুলিয়ায় চলে যাও। সেখানে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে দশাশ্বমেধ রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বনাথ গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ও সুধাংশু কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসছি। তারপরে একসঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শনে যাবো।

—কিন্তু গোধুলিয়ায় রিক্সা ছেড়ে দেব কেন? আমরা তো রিক্সা নিয়েই বিশ্বনাথ গলির মুখে চলে যেতে পারি?

আমি কিছু বলতে পারার আগে আমাদের রিক্সাওয়ালাই ভাঙা ভাঙা বাংলায় উত্তর দেয়— নহী সাব্। আভি মতলব বিকালবেলা সে রাত দশ বাজে তক দশাশ্বমেধ ঘাট রোডমে কোই গাড়ি চলতে দেয় না। আপলোককো গোধুলিয়ামে উতরানে পড়েগা।

মনোরঞ্জন মাথা নাড়ে। বলে—বেশ তাই নেমে পড়ব। আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।

ওদের রিক্সা এগিয়ে যায়। আমি বসে বসে কাশীর পথ দেখতে থাকি। কাশীর প্রধান পথগুলিতে সর্বদা ভিড় লেগেই আছে। একে কাশী শুধু তীর্থস্থান নয়, উত্তর প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, তার ওপরে প্রয়োজনের তুলনায় কাশীর পথ বড়ই সংকীর্ণ। ফলে বিভিন্ন যানবাহন ও রিক্সার

দৌরাত্ম্যে নাগরিকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। রিক্সার গতিবেগ সামান্য কিন্তু পায়েচলার উপায় নেই। রিক্সার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই কাশীতে রিক্সা নিতে হয়। আমরাও তাই নিয়েছি।

এ পথটির নাম লাক্সা রোড। এ পথে যানবাহনের ভিড় অন্যান্য পথের চেয়ে বেশি। কারণ প্রধান রেলস্টেশন বেনারস-ক্যান্ট্ থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল গোধুলিয়ায় পৌঁছবার সংক্ষিপ্ততম পথ এটি। তাহলেও একসময়ে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে পৌঁছে গেলাম।

পথের ডানদিকে সুবিশাল এলাকা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন 'হোম অব্ সার্ভিস'। এটি বারাণসীর একটি বৃহত্তম হাসপাতাল। প্রায় আশি বছর ধরে এঁরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে আর্তমানবের সেবা করে চলেছেন...

না, কথাটা ঠিক বলা হল না, প্রায় আশি বছর ধরে বারাণসীর একটি বড় হাসপাতাল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর জন্ম ১৯০০ সালের ১৩ই জুন। সেদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্তে যামিনীরঞ্জন নামে এক কপর্দকহীন তরুণ ছাত্র বাঙালীটোলার একটি গলি দিয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছিলেন। এই সময় তাঁর কানে এলো মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধার আকুল আর্তনাদ — আমি চারদিন কিছু খাই নি, আমাকে চারটি ভাত দিন!

যামিনীরঞ্জন শুধু কপর্দকহীন নন, তিনি নিজেও অন্যের গলগ্রহ। চারুচন্দ্রের বাড়িতে থাকেন আর একটি সত্রে দু-বেলা খেতে পান। তবু তিনি ভাবলেন, তিনি যদি এখুনি এঁকে কিছু খাবার না দিতে পারেন এবং পরে এঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারেন, তাহলে বৃদ্ধা মারা যাবেন।

তাই করেছিলেন যামিনীরঞ্জন। তখুনি দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে ভিক্ষে করে চার আনা পয়সা যোগাড় করে দুধ ও হালুয়া কিনে সেই বৃদ্ধা নৃত্যকালী দাসীকে খাইয়েছিলেন। তারপরে তাঁর আশ্রয়দাতা চারুচন্দ্র ও তাঁর বন্ধু কেদারনাথের সাহায্যে বৃদ্ধাকে ভেলুপুরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

এইভাবে যে সেবাকার্য শুরু হয়েছিল, তারই বর্তমান রূপ, এই সুবিশাল আধুনিক হাসপাতাল, সেই সঙ্গে অদ্বৈত মঠ। 'বীজ থেকে বনস্পতি' কথাটা যে কতখানি সত্য, তা এখানে বাস করে উপলব্ধি করে গিয়েছি।

অবশ্য এই রূপের পেছনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কিছু কম নয়। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজি কাশী এসেছিলেন। তখন চারুচন্দ্র যামিনীরঞ্জন কেদারনাথ এবং আরও কয়েকজন সেবাপরায়ণ তরুণের সঙ্গে মিলিত হয়ে "The Poor Men's Relief Association" পরিচালনা করছেন। মাসিক দশটাকা ভাড়ায় রামাপুরায় একখানি ঘর নিয়ে তাঁদের "Home of Relief" চালাচ্ছেন। স্বামীজি তাঁদের কাজ দেখে ভারী খুশি হলেন। এই সময় একদিন লখনউ-য়ের একজন জমিদার স্বামীজিকে পাঁচশ' টাকার একখানি চেক প্রণামী দিলেন। সঙ্গী শিবানন্দজী মহারাজের হাতে সেই চেকখানি দিয়ে স্বামীজি বললেন— মহাপুরুষ, এই টাকা দিয়ে কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।

এইভাবে অদ্বৈত মঠের প্রতিষ্ঠা হল।

একদিন কথায় কথায় স্বামীজি চারুচন্দ্রদের বললেন — তোমরা বেশ ভাল

কাজ করছ। কিন্তু Who are you to render relief? Nothing beyond service is within your scope.... My sons, name of your institution, "Home of Service". সেই নামেই আজও এই সেবাপ্রতিষ্ঠানের পরিচিতি।

স্বামীজি মাত্র তিন সপ্তাহ কাশীতে ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ শিষ্য ও ভক্তদের সংঘবদ্ধ করে সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। কলকাতা রওনা হবার আগে সেবাশ্রমের কর্মীরা তাঁকে অনুরোধ করেন, আপনি যদি কাশীবাসীদের কাছে আমাদের জন্য একটি আবেদন রেখে যান, তাহলে বড়ই ভাল হয়।

স্বামীজি সে অনুরোধ রক্ষা করে, মুখে মুখে যে আবেদনটি বলে গিয়েছেন, আজ নব্বুই বছর বাদেও সেবাশ্রমের সেটি সবচেয়ে বড় সম্পদ। আবেদনের শেষাংশে স্বামীজি বলেছেন—

"—Come and lend us a helping hand

Never mind if your contribution is only a mite, your help is only a little; blades of grass united into a rope will hold in confinement the maddest of elephants;....".

সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। কারণ কেবল হাসপাতাল নয়, সেইসঙ্গে এখন এখানে রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম, অদ্বৈত মঠ, গোশালা, ফুল ও ফলের বাগান, সবজিক্ষেত ও অতিথি নিবাস। পাখির কলরবে মুখরিত শান্ত নির্জন ও ছায়াশীতল অতিথি নিবাসে আমি কয়েকবার বেশ কয়েকদিন ধরে বাস করে গিয়েছি। আর প্রতিদিন স্বামীজিদের নিঃস্বার্থ মানবসেবা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

সুতরাং এবারেও আমাকে আসতে হবে মিশনে। স্বামীজিদের প্রণাম করে যেতে হবে। তখন মিশনের কথা হবে। এখন মিতার বাড়িতে যাওয়া থাক।

মিশনের পাশেই সরু গলি — কাশীর গলি। তার ওপরে চড়াই। রিক্সা ছেড়ে দিয়ে হেঁটে চলি। বলা বাহুল্য আমাদের গতিবেগ বেড়েছে।

মিতাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। পুজোর ছুটির পরে এখনও তার কলেজ খোলে নি। আগেই বলেছি, মিতা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের কলেজে ইংরেজী পড়ায়। ওরা দু-ভাই এক বোন। মিতা মাঝখানে। ওর দাদা সপরিবারে আমেরিকায় আর ভাই দিল্লীতে। মাসিমা মানে মিতার মা-ও দিল্লীতে রয়েছেন। মিতা বিয়ে করে নি। সুতরাং সে এখন এখানে একা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিতা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমরা বড় রাস্তায় না এসে গলিপথেই এগিয়ে চলি। কয়েক মিনিট বাদে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছই। সামনেই হোটেল যমুনা। লাক্সা রোডের ওপরে দোতলা বাড়ি, মাঝারি আকারের, বেশ ছিমছাম। নিচের তলায় দোকান, কার-পার্ক ও রিসেপশন আর খান দুয়েক ঘর। দোতলায় হোটেলের বৃহত্তর অংশ এবং ডাইনিং হল। দোতলাতেই বাথরুমযুক্ত পাশাপাশি চারখানি ঘর পাওয়া যাবে আগামীকাল সকাল ন'টায়। হোটেলের মালিক মিতার পরিচিত। সুতরাং কিছু কনসেশানও পাওয়া গেল। অবস্থানটি বেশ ভাল। গোধুলিয়া হাঁটাপথে মাত্র মিনিট ছয়েক। অতএব সুধাংশু কিছু অগ্রিম দিল। ঠিক

হল কাল সকালে আমরা সবাই চলে আসব এখানে।

কাজটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা বহু বছরের। আমি ওঁদের গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, পুরী, নবদ্বীপ, দিল্লী ও এই কাশী যাত্রীনিবাসে বাস করেছি। রাত্রিবাস করেছি মহীষাদল শিউড়ি ও ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্রে। তার ওপরে স্বামী সদাশিবানন্দজীর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। একবার আমি কেবল সংঘের দুর্গাপূজা দেখতেই কাশী এসেছি।

সুতরাং মাত্র একটি রাত কাটিয়ে স্বামীজির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া খুবই কঠিন হবে। কিন্তু এবারে আমি সুধাংশুর সঙ্গে কাশী এসেছি। ওদের সঙ্গেই থাকতে হবে আমাকে। সে মনে করছে সেবাশ্রমের যাত্রীনিবাসে আমাদের বাস করার অর্থ অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল যাত্রীদের বঞ্চনা করা। সে বিবেকের দংশন অনুভব করছে। এ অবস্থায় যেভাবেই হোক স্বামীজির অনুমতি নিতে হবে।

তবে এসব কালকের ভাবনা। এখন তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক। ওরা বিশ্বনাথ গলির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লাক্সা রোডের ওপরে হোটেল যমুনা, গোধুলিয়া যেতে ডানদিকে। একটু এগিয়েই বাঁদিক থেকে চৈৎগঞ্জ রোড ও ডানদিক থেকে দুর্গাকুণ্ড রোড এসে মিলিত হল লাক্সা রোডের সঙ্গে। লাক্সা রোড নামটিও শেষ হয়ে গেল এখানে। তার নতুন নাম হল গোধুলিয়া রোড। সুপ্রশস্ত কিন্তু নাতিদীর্ঘ একফালি পথ। গোধুলিয়া মোড় তথা মদনপুরা রোডের সঙ্গম পর্যন্ত প্রসারিত।

আমি বলছি গোধুলিয়া। আমরা বাঙালীরা তাই বলি। কিন্তু স্থানীয়রা বলেন গোদৌলিয়া অথবা গদৌলিয়া। কারণ নামটা হয়েছে গোদাববী থেকে। সুদূর অতীতে নাকি গোদাবরী নামে একটি নদী এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত হত। আর এখন যেখানে বিশ্বনাথ গলি সেখানে ছিল সেই নদীর ওপরে তিন নম্বর পুল। তাই এখনও স্থানীয়রা কেউ কেউ বিশ্বনাথ গলিকে 'তিসরি' বা তিন নম্বর বলেন।

ওরা আমাদের পথ চেয়ে বিশ্বনাথ গলির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছতে চাইছি। কিন্তু চাইলেই তো কাশীর পথে পা চালানো যায় না। হোটেল যমুনার সামনে লাক্সা রোড পার হয়ে চৈৎগঞ্জ রোডের মোড়ে আসতেই দশ মিনিট কেটে গেল। এটা আবার অটো-রিক্সার আড্ডা। মিতা কাশীর মেয়ে। সুতরাং কাশীতে পথচলার কায়দা জানা আছে তার। সে হাত ধরে আমাদের দুজনকে গোধুলিয়া মোড়ে নিয়ে আসে।

এখানে গোধুলিয়া রোড এসে মদনপুরা রোডে মিশেছে আর দশাশ্বমেধ ঘাট রোড বের হয়ে গঙ্গার দিকে অর্থাৎ পূর্বে প্রসারিত হয়েছে। পাঁচের দশকে প্রথম যখন কাশী এসেছি, তখন এখানে টাঙ্গার বিরাট আড্ডা ছিল। তখন সাইকেল রিক্সার সংখ্যা সামান্য, টাঙ্গাই ছিল কাশী দর্শনের প্রধান বাহন। তারপরে রিক্সা বেড়েছে, অটো-রিক্সা এসেছে, টাঙ্গা কমেছে। কিন্তু ছয় ও সাতের দশকেও এখানে টাঙ্গাওয়ালাদের রমরমা ছিল। আটের দশক থেকে রিক্সা, অটো-রিক্সা ও ট্যাক্সির আক্রমণে টাঙ্গার সংখ্যা কমতে শুরু করে। অবশ্য এই নয়ের দশকেও তারা লুপ্ত

হয়ে যায় নি, কয়েকখানি রয়েছে এবং সবচেয়ে বড়কথা টাঙ্গাওয়ালারা মোড়ের মাথায় তাদের ছোট আস্তাবলটির দখল এখনো ছেড়ে দেয় নি। কাজটি কোনমতেই সহজ নয়। কারণ জায়গাটিতে একটি চমৎকার ফ্ল্যাটবাড়ি উঠতে পারে। এবং এখন কাশীতেও প্রচুর বিল্ডিংস প্রোমোটার রয়েছে।

টাঙ্গার ভাবনা ছেড়ে দশাশ্বমেধ ঘাট রোড ধরে এগিয়ে চলি। এপথে এখন গাড়ি-ঘোড়া বিশেষ করে রিক্সার ঝামেলা নেই। তবু সাধ্য কি তাড়াতাড়ি পথ চলি। কারণ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত যে কোন ঋতুতে, সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যে যে কোন সময়ে, এপথে চলা শুরু করলেই মনে হয় আমি বুঝিবা কোন মিছিলে মিশে গিয়েছি। এখানে তাড়াতাড়ি একা পা চালাবার উপায় নেই। এপথে সারাদিনই শোভাযাত্রা — মানুষের মহামিছিল। কেবল ভারতের মানুষ নয়, বিদেশীদের সংখ্যাও রীতিমত উল্লেখযোগ্য। সত্যি বলতে কি, সারা বিশ্ব এসে মিলিত হয়েছে এপথে। প্রকৃত অর্থেই 'যত্র বিশ্ব ভবেত্যকং নীড়ম্'।

তবু ওদের খুঁজে পেতে খুব সময় লাগে না, মিতার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই। তারপরেই টুকু বলে ওঠে — এবারে চলুন! সেই কখন কাশী এসেছি, আর এখনও বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করতে পারলাম না। বাবা যে রেগে যাবেন!

না! বাবা বিশ্বনাথ রাগ করবেন না। তিনি যে মানুষের ভগবান। তিনি অন্তর্যামী, স্বল্পে তুষ্ট, সর্বংসহ। তিনি চির-মঙ্গলময়।

তাহলেও টুকুর কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। কারণ যেখানে ধুলোপায়ে দর্শনের নিয়ম, সেখানে ঘন্টা আটেক আগে কাশী এসে আমরা এখনও বিশ্বনাথ দর্শন করি নি। তার ওপরে ওদের এই প্রথম কাশীতে আসা।

অতএব কথা না বাড়িয়ে সদলবলে বিশ্বনাথ গলিতে প্রবেশ করি। কিন্তু এ গলিতে প্রবেশ করা আর এগিয়ে চলা এককথা নয়। একে তো দর্শনার্থীদের বিরামহীন শোভাযাত্রা, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় য়ুরোপ ও দূর-প্রাচ্যের ডজনখানেক দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু লণ্ডন পারি বার্লিন থেকে ব্যাঙ্কক সিঙ্গাপুরের পথে প্রচুর পায়চারি করেও এমন একটি সহজ সরল প্রাণময় আনন্দোচ্ছল আলো-ঝলমল গলি চোখে পড়ে নি। আর একথা কেবল আমার বেলাতেই সত্য নয়, গাব্রিয়েল রিফস্থালের ক্ষেত্রেও নাকি সমান সত্যি। সে-ও নাকি এ গলিতে ঢুকে দেহাতি মেয়েদের মতো বিস্ফারিত চোখে কেবলি চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখেছে।

পথের মানুষরা অবশ্য শুধুই দেখছেন না, কিছু কেনাকাটাও করছেন। আর ক্রেতাদের জটলায় মাঝে মাঝে পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কখনও পাশ কাটিয়ে, কখনও বা ভিড় ঠেলে আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলি। কারণ আজ আমাদের কেনাকাটা নয়, আজ পুজোও নয়, আজ শুধুই দর্শন — বিশ্বনাথ দর্শন।

কেবল দোকানপাট নয়, বিশ্বনাথ গলিতে দোকানপাটের মাঝে কয়েকটি দর্শনও রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই সদ্য নির্মিত। কেবল একটি ব্যতিক্রম, সেটি শঙ্করাচার্যের ছোট মন্দির। মন্দিরে বালক আদিশঙ্করাচার্যের মূর্তি, এটি কাশীর প্রাচীনতম চারটি মূর্তির অন্যতম। অন্য তিনটি রয়েছে কৈলাস মঠ, বোধগয়া মঠ ও কুমেরু মঠ। শঙ্করাচার্যকে প্রণাম করে আমরা আবার দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

দেখতে দেখতে একসময় বিশ্বনাথ মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছুই। আর সেখানেই দেখা হয়ে যায় পাণ্ডা রামচন্দ্রজীর সঙ্গে। প্রবীণ পূজারী। রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য। বিশ্বনাথ মন্দিরের বেশ ক্ষমতাশালী পাণ্ডাও বটে। এযুগে কিছু ক্ষমতা না থাকলে দেবপূজারও অংশীদার হওয়া যায় না।

রামচন্দ্রজী আমাকে দেখে খুশি হন। বলেন—এবারে যে চিঠি না লিখেই চলে এলেন?

—সময় পাই নি। তবে ভেবেছি, সন্ধ্যার সময়ে আপনি সাধারণত মন্দিরেই থাকেন, বাবার কৃপায় দেখা হয়ে যাবে।

তিনি দুহাত তুলে কপালে ঠেকালেন। আমি তাঁর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই। তারপরে রামচন্দ্রজী বলেন—খুব ভাল সময় এসেছেন, আগে দর্শন করে নিন। তারপরে একেবারে সন্ধ্যারতি দেখে যাবেন।

—পুজো দিতে পারব না? অর্চনা জিজ্ঞেস করে।

—না মা। পুজো আরেকদিন দেবেন। সকালে অভুক্ত থেকে গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে আসতে হবে। আপনারা তো আছেন কয়েকদিন।

—হ্যাঁ। আরও ন'দিন। সুধাংশু বলে।

—তাহলে আর অসুবিধে কি? সামনের সোমবার সকালে পুজো দেবেন। এখন চলুন, দর্শন করে সন্ধ্যারতি দেখবেন। আচ্ছা, ছেলে-মেয়েদের বাদ দিয়ে আপনারা ক'জন?

—সাতজন। কিন্তু কেন বলুন তো?

—টিকেট নিতে হবে, আরতি দেখার টিকেট।

—টিকেট আছে বুঝি?

—হ্যাঁ। পাণ্ডাজী সামনের ফুলের দোকানটি দেখিয়ে বলেন— এখান থেকে মায়েরা ফুল ও মালা নিয়ে নিন। আর জুতো ও হাতের ব্যাগ সব দোকানীর কাছে জমা রেখে দিন। টাকা পয়সা সঙ্গে রাখুন কিন্তু সামলে রাখবেন। মায়েদের কারও গায়ে সোনার জিনিস নেই তো?

দোকানীর গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে নিই। তারপরে ফুল ও মালা নিয়ে মেয়েরা পাণ্ডাজীর পেছনে হাঁটতে শুরু করে। তিন ছেলে ও মেয়েটাকে নিয়ে আমরা ওদের অনুসরণ করি।

বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান তোরণ। রুপোর পাত দিয়ে মোড়া কারুকার্যখচিত সুবিরাট দরজা। আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। এটি শিব মন্দির। শিব সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত প্রতীক। শিব মিলনের মূর্ত বিগ্রহ—জাতি ধর্ম ও বর্ণের মিলন। শিব ঐক্যের অগ্রদূত। তবু দুর্ভাগ্যের কথা এ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। আর তাই আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল শিবভক্ত হয়েও এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে নি।

তোরণ পার হয়েই আয়তক্ষেত্রাকার পাথর বাঁধানো অঙ্গন, দুটি স্তরে। তারপরে মূল-মন্দির। তাও দুটি ভাগে—নাটমন্দির ও গর্ভগৃহ। কিন্তু এই একই মন্দিরাঙ্গনে বিশ্বনাথ মন্দির ছাড়া আরও অনেক মন্দির রয়েছে, চারিদিকের বিভিন্ন ঘরে। তাঁদের

মধ্যে অবিমুক্তেশ্বর, অবিমুক্ত বিনায়ক, নিকুম্ভ, মহাকালী, দণ্ডপাণি বিরূপাক্ষ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দর্শনীয়। তবে আজ নয়, পুজোর দিনে পাণ্ডাজী আমাদের সেসব মন্দির দর্শন করাবেন।

দু-ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে অঙ্গনের দ্বিতীয় স্তরে উঠে আসি। সামনেই বিশ্বনাথ মন্দির। ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ ১৭৭৭ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাঈ সারা ভারতে বহু মন্দির, ধর্মশালা ও তীর্থপথ তৈরি করে দিয়েছেন। বারাণসী ছাড়া পুরী, গয়া, দ্বারকা, রামেশ্বর, সোমনাথ ও কেদারনাথ প্রভৃতি তীর্থে তাঁর দানের কথা আজও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

গম্বুজাকৃতি মন্দিরশীর্ষ, দুপাশে দুটি শিখর। ১৮৩৯ সালে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং গম্বুজটিকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। তাই বিশ্বনাথ মন্দিরের অপর নাম স্বর্ণমন্দির।

আমরা নাটমন্দিরে উঠে আসি। কারুকার্যখচিত পাথরের স্তম্ভযুক্ত চারিদিক খোলা ছোট নাটমন্দির। বেশ ভিড়। বহুলোক দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছেন। বলা বাহুল্য আরতি দর্শনের আশায় সমবেত হয়েছেন। এঁরা টিকেট কাটবেন না, তাই তখন গর্ভগৃহে থাকতে পারবেন না বলে এখানে জায়গা নিয়েছেন।

ভিড় ঠেলে গর্ভগৃহের দরজায় আসি। এ দরজাটিও রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। দরজা পার হয়ে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করি। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে, পুলকের শিহরণ। আমি ভাগ্যবান। আবার আমার ইষ্টদেবতা বিশ্বনাথেব মন্দিরে এসেছি। আমার দুচোখের কোল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা, আনন্দাশ্রু। কামাখ্যা থেকে সোমনাথ পর্যন্ত সংখ্যাতীত শৈবতীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু কাশী কেদারনাথ ও অমরনাথ ছাড়া আর কোথাও আমি এমন অবাধ্য অশ্রুধারায় বিগলিত হই না। এবং এতবার এই মন্দিরে এসেও আমি এই অবাধ্য অশ্রুকে সংযত করতে পারলাম না। কেন এই অশ্রুধারা, যেমন জানা নেই আমার, তেমনি জানি না এই অশ্রুর উৎস কোথায়?

খ্যাতির তুলনায় নিতান্তই সাধারণ ও ছোট মন্দির। যেমন প্রাচীনত্বের বড়াই নেই, তেমনি স্থাপত্যশৈলীও উল্লেখ করবার মতো কিছু নয়। কিন্তু আমরা তো মন্দির দেখতে আসি নি, এসেছি শিবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্তি দর্শন করতে। তিনি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। তিনি অনাদি ও অনন্ত। বার বার তাঁর মন্দির ধ্বংস করেও তাঁকে ধ্বংস করা যায় নি। রাণী অহল্যাবাঈ মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে নতুন কোন লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় নি। সেই অনাদি-অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে। তিনি আছেন এবং থাকবেন চিরকাল। আর তাই এ মন্দিরে সর্বদা ভক্তিভাব বিরাজ করে। নাস্তিকও এই মন্দিরে এসে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন।

পাণ্ডাজীর সঙ্গে গর্ভমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে আসি। এখানেই একটি ছোটকুণ্ড, রুপো দিয়ে বাঁধানো। মাত্র ফুটদুয়েক গভীর। তারই ঠিক মাঝখানে বাবা বিশ্বনাথ। সোনার গৌরীপট আর কৃষ্ণপাথরের স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্তি। মূর্তিটি সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, ওপরের দিকটা লম্বাটে ধরণের, কিছুটা চাপা।

ভক্তরা শিবের মাথায় অবিরত দুধ ঢালছেন, ফুল-বেলপাতা দিচ্ছেন আর তাঁর গলায় মালা পরাচ্ছেন। আমাদের মেয়েরাও তাই করে। প্রণামী দেয়। আমরা আশীর্বাদ ও চরণামৃত পাই।

পাণ্ডাজীর সঙ্গে দরজার কাছে আসি। মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজা। একটির কথা আগেই বলেছি। বাকি তিনটি অষ্টধাতুর তৈরি, গায়ে জালির কাজ। আমরা বাঁদিকের দরজা দিয়ে বাইরে আসি। রামচন্দ্রজী বলেন—আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। এই সিঁড়ির ধাপগুলোই আরতি দর্শনের সিট।

অতএব আমরা ধাপের ওপরেই বসে পড়ি। আরও কয়েকজন বসে রয়েছেন। বুঝতে পারছি এঁরাও আরতি দর্শনের টিকেট নিয়েছেন।

এখনও দর্শন চলেছে। যাঁরা কুণ্ডের সামনে প্রথম সারিতে রয়েছেন, তাঁরা বসে স্তবপাঠ করছেন, বিশ্বনাথকে ফুল ও মালা দিচ্ছেন, দুধ দিয়ে স্নান করাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি করে উঠছেন—জয় জয় বিশ্বনাথ! জয় শিব শম্ভু!

দর্শন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মন্দিরের দুটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। পেছনের দরজাটি সর্বদা বন্ধই থাকে। যাঁরা ভেতরে ছিলেন, তাঁরাও দর্শন শেষে বেরিয়ে গেলেন এই দরজা দিয়ে। এটি কিন্তু খোলা থাকল। আমরা এখান থেকে সন্ধ্যারতি দর্শন করব বলে নয়, মন্দিরের যাবতীয় কাজ এখন এই দরজা দিয়েই করা হবে।

আমাদের পাণ্ডাজীসহ বেশ কয়েকজন পূজারী ও সেবক কাজ শুরু করেছেন। প্রথমে গৌরীপটের ফুল-বেলপাতা তুলে টাকা-পয়সা খুঁজে নেওয়া হল। ফুল-বেলপাতা ফেলে দিয়ে কুণ্ডটি পরিষ্কার করে শুরু হল বিশ্বনাথকে স্নান করানো, ঘড়া-ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে। স্নানের পরে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে লিঙ্গমূর্তিকে মুছিয়ে নিয়ে তাঁর সারাগায়ে তেল মাখানো হল।

তারপরে আলপনা। কাচা-হলুদ বেটে নিয়ে তার সঙ্গে তেল মিশিয়ে, তাই দিয়ে শিবদেহে আলপনা। অবশেষে শৃঙ্গার, নানা রঙের ফুল ও মালা দিয়ে শিবের অঙ্গসজ্জা। বলা বাহুল্য ফুলের সঙ্গে বেলপাতাও শিবসজ্জায় অংশ নিল। সাজানো শেষ করে পূজারী চারটি রুপোর সাপ বের করলেন। সাপ-চারটিকে লিঙ্গমূর্তির চারপাশে রেখে তাদেরও মালা দিয়ে সাজালেন।

এইভাবে স্নান ও শৃঙ্গার চলল ঘন্টাখানেক ধরে। শৃঙ্গার শেষে বন্ধ দরজা দুটি খুলে দেওয়া হল। সবাই আরতি দর্শন করতে পারবেন।

চারিদিকে প্রচুর চন্দন-ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে শুরু হল সন্ধ্যারতি। ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপ ও ঘন্টা সহযোগে আরতি। গৌরীপটের চারিদিকে দাঁড়িয়ে চার পুরোহিত পালা করে আরতি করতে থাকলেন। আর মাঝে মাঝে ভক্তরা জয়ধ্বনি করতে থাকলেন—জয় জয় বিশ্বনাথ! জয় শিব শম্ভু!

একই কথা নানা কণ্ঠে নানা সুরে। শিববন্দনার সঙ্গে শিবারতির ঘন্টাধ্বনি মিলে মিশে এক পরমানন্দময় স্বর্গীয় সুর সৃষ্টি করেছে, রচনা করেছে এক অপার্থিব পরিবেশ।

আর আমরা এই মর্ত্যভূমির অতি সাধারণ মানুষ হয়েও সেই স্বর্গীয় আনন্দে অবিরত অবগাহন করে চলেছি।

রাত ন'টায় সন্ধ্যারতি শেষ হল। এবারে কাশী এসে প্রথমদিনটি ফুরিয়ে গেল আমার। সবার সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়াই। আরেকবার দর্শন করি বাবা বিশ্বেশ্বরকে। যাঁর অসীম কৃপায় আমাদের বংশরক্ষা পেয়েছে, যাঁর করুণায় আমি গাব্রিয়েলের মতো বোন পেয়েছি, যাঁর দয়ায় আমি বিদেশভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি, আমার সেই

পরমপ্রিয় পরমারাধ্য বিশ্বনাথকে পুনরায় প্রণাম করি। আর প্রার্থনা করি—হে ঠাকুর! আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দিও! আমি যেন শান্তচিত্তে শান্তিতে গঙ্গাতীরে গঙ্গালাভ করতে পারি!

॥ তিন ॥

আশ্রমে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েই প্রসাদ পাওয়া গেল। স্বামীজি সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন আর সুধাংশু মহারাজ নিজে পরিবেশন করলেন। এঁদের এই আন্তরিকতা, এই সেবাধর্ম সত্যই অতুলনীয়।

আগেই বলেছি একে প্রসাদ পাওয়া না বলে ভুরিভোজ বলাই উচিত হবে। ভাত ডাল ভাজা দু-রকমের তরকারী চাটনী মিষ্টান্ন ও মিষ্টি। যেমন উপাদেয় রান্না, তেমনি পরিবেশন।

প্রসাদেব পরে মন্দিরে ঠাকুর প্রণবানন্দকে প্রণাম করে যাত্রীনিবাসে চলে আসি।

দোতলায় উঠে এলাম। তিন ছেলেকে নিয়ে আমার ঘরে আসি। ওদের সাহায্যে বিছানা ঠিক করে ফেলি। কিন্তু শুয়ে পড়তে পারি না। ছেলেদের মা ও বাবারা মেয়েটাকে নিয়ে হাজিব হয়। একটু অবাক হই। বলি—এত রাতে আবার এলে?

আমাদের বিছানায় বসে বিনা প্রস্তাবনায় টুকু প্রস্তাব করে—বিশ্বনাথ দর্শন তো করিয়ে আনলেন দাদা! কিন্তু কাশী, কাশীশ্বব ও তাঁর মন্দিরের কথা তো কিছুই বললেন না?

—সে তো অনেক কথা!

—তা হোক্‌গে, আপনি বলুন।

—কিন্তু রাত সাড়ে দশটা। তোমরা আজ ক্লান্ত।

—আমরা তো দুপুবে ঘুমিয়েছি জেঠু! সবাব ছোট বাবলাই সবার আগে বলে ওঠে।

বাবলার কথা শুনে ওবা হেসে ওঠে। আমাবও হাসি পায।

হাসি থামলে সুধাংশু বলে--আর আপত্তি কবাব কিছু নেই। এবারে শুরু করে দিন।

অতএব শুরু করতে হয়—বিশ্বনাথই যে কাশীশ্বর এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কত কাল? কত কাল আগে বিশ্বনাথ কাশীশ্বব হয়েছেন?

কাশীখণ্ড ও অন্যান্য কয়েকখানি পুরাণে বলা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত থেকে বিশ্বনাথই কাশীশ্বর। কিন্তু ঐতিহাসিকরা হয়তো পুবাণের কথা মানতে চাইবেন না। তবু তাঁরাও স্বীকার করেন, দেড় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর কাশীনাথরূপে পূজিত হচ্ছেন। গুপ্তযুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তিনিই ছিলেন কাশীশ্বর। তবে সেকালের বিশ্বনাথ মন্দিরে সম্ভবত দুটি লিঙ্গমূর্তি পূজিত হত। একটি বিশ্বেশ্বর যাঁকে আমরা আজ দর্শন করে এলাম, অপরটি অবিমুক্তেশ্বর।

কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে, শিব যখন রাজা দিবোদাসের হাতে কাশীর শাসনভার তুলে দিয়ে পার্বতীকে নিয়ে মন্দার পর্বতে চলে যান, তখন তিনি নিজেই কাশীধামে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন।

—এখন তাহলে অবিমুক্তেশ্বর কোথায় রয়েছেন? মাঝখান থেকে মনোরঞ্জন বলে ওঠে।

উত্তর দিই—বিশ্বনাথ মন্দিরচত্বরে, এক কোণে আশ্রয়প্রার্থীর মতো পড়ে আছেন কোনমতে। অথচ কাশীকে আজও অবিমুক্তক্ষেত্র বলা হয়।

—আমরা তো তাঁকে দর্শন করলাম না? ধীরেন জিজ্ঞেস করে।

বলি—আজ তো বিশ্বনাথ ছাড়া আর কিছুই দেখো নি। আরেকদিন অন্য সব মূর্তি ও জ্ঞানবাপী দর্শন করবে।

—কিন্তু বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন কেমন করে? সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে মুসলমান তথা তুর্কী আক্রমণের সময় এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরবর্তীকালে বিশ্বেশ্বরের জনপ্রিয়তায় অবিমুক্তেশ্বর চাপা পড়ে যান। ফলে এখন তাঁকে বিশ্বেশ্বরের আশ্রিত রূপে বিশ্বনাথ মন্দিরে বাস করতে হচ্ছে। অথচ কাশীতে কিছু ভক্ত আছেন যাঁরা মনে করেন, অবিমুক্তেশ্বর হচ্ছেন বিশ্বেশ্বরের গুরুস্থানীয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং আমরাও তাঁদের দলভুক্ত নই। কারণ কাশী অবিমুক্তক্ষেত্র হলেও বিশ্বেশ্বরই কাশীশ্বর। এবং ত্রয়োদশ শতকে রচিত কাশীখণ্ডেও এই কথাই বলা হয়েছে।

একটু থেমে আবার শুরু করি—এবারে বিশ্বনাথ মন্দিরের কথায় আসা যাক। তোমরা সবাই জানো, বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দিব মাত্র ১৭৭৭ সালে তৈরি হয়েছে।....

ওরা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—কাশীর মতই সুপ্রাচীন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। সুতরাং এই মন্দির নির্মাণের আগেও কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির ছিল।....

—কোথায়? টুকু প্রশ্ন করে।

—সেকথা জানতে হলে সেই সুদূর অতীতে কাশীর ভৌগোলিক অবস্থানটি জানতে হবে। কাশীখণ্ডের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, কাশীর প্রাকৃতিক দৃশ্য পরম রমণীয়। উত্তরবাহিনী গঙ্গার শ্যামল উপত্যকায় পাশাপাশি তিনটি পাহাড়। দূর থেকে তাদের মহাদেবের ত্রিশূল বলে মনে হত। মাঝখানের পাহাড়টাতেই প্রথম বসতি গড়ে ওঠে, এখানেই প্রথম বিশ্বনাথ মন্দির নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে পাশের দুটি পাহাড়েও জনবসতি শুরু হয়। আর তারপরে সেই জনবসতি পাহাড় তিনটির গা বেয়ে সমতলে প্রসারিত হতে থাকে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সেই পাহাড় তিনটির অস্তিত্ব যায় হারিয়ে। হারিয়ে যায় তাদের ঝরণা ও নদী, বন ও উপবন। সেকালের কাশীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একালে কল্পনাও করা যাবে না।

যাক্‌গে যেকথা বলছিলাম। সেই পাহাড় তিনটির উত্তরেরটি হল একালের রাজঘাট, দক্ষিণেরটি কেদারঘাট আর মাঝখানেরটি বিশ্বনাথ পাহাড়—একালের চক বাজার অঞ্চল।

—তাহলে সেকালের বিশ্বনাথ মন্দিরটি ঠিক কোথায় ছিল? অর্চনা জিজ্ঞেস করে।

—বাস্তবিকপক্ষে এই অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে বিশ্বনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে। মানে প্রথম দিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরবর্তীযুগে ধর্মান্ধ আক্রমণকারীদের ধ্বংসলীলার জন্য বার বার নতুন নতুন জায়গায় নতুন মন্দির নির্মাণ করতে হয়েছে। যেমন তোমরা যখন বেনারসী কিনতে চকবাজারে যাবে, তখন দেখবে বাঁদিকে

একটি নতুন সত্যনারায়ণ মন্দির তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের পেছনে সপ্তম শতাব্দীর শেষে বিশ্বনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ করেছিলেন অম্বরের মহারাজা। কারণ সম্ভবত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার আগে আদি-বিশ্বেশ্বর মন্দিরটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই কাছাকাছি একটা ভাল জায়গা বেছে তিনি নতুন আদি-বিশ্বনাথ মন্দির তৈরি করে দেন। আগের মন্দিরটি ছিল আরও উঁচুতে বিশ্বনাথ পাহাড়ের ঠিক ওপরে, এখন যেখানে রাজিয়া মসজিদ।....

—রাজিয়া মানে রাজিয়া সুলতানা? অঞ্জু বলে ওঠে।

মৃদু হেসে উত্তর দিই—হ্যাঁ। দিল্লীর একমাত্র মহিলা সম্রাজ্ঞী।

—তিনি আদি-বিশ্বনাথ মন্দিরের জায়গায় মসজিদ তৈরি করেছেন! টুকুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। তবে সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে খানিকটা নিচে নতুন বিশ্বনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সুলতানার সম্ভবত আগের মন্দিরের জায়গাটি বেশি পছন্দ হয়, তাই তিনি সেখানেই মসজিদ তৈরি করেন।

যাক্‌গে রাজিয়া মসজিদের কথা থাক, আদি-বিশ্বনাথ মন্দিরের কথায় ফিরে আসা যাক। তোমরা জানো সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ ভারতে এসেছিলেন। সেকালের কাশী ও সেই প্রথম আদি-বিশ্বনাথ মন্দির সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন—"A city in which a single temple stands out as impressive: a great temple upon a hill.....The city around it is alive with beautiful dancing girls....."

এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বর্তমান বাঈজী মহল্লা ডালমাণ্ডির অনতিদূরে অবস্থিত রাজিয়া মসজিদের জায়গাতেই সেকালের বিশ্বনাথ মন্দির অবস্থিত ছিল এবং তখন সেটি কাশীর একমাত্র মন্দির।

—তার মানে আজ যদি বলি, আমাদের সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমরা ওখানে একটি মন্দির তৈরি করতে চাই, তাহলে কাশীও অযোধ্যা হয়ে উঠবে! প্রশ্নটা শেষ করে ধীরেন আমার দিকে তাকায়।

কিন্তু আমার পক্ষে ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তাহলেই শুনতে হবে, আমি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছি। অতএব অন্যকথা বলি—সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত নতুন মন্দিরে বিশ্বনাথ প্রায় পাঁচ-শ' বছর বিরাজ করেছেন। তারপরে ১১৯৪ সালে বিশ্বনাথের এই আনন্দনিকেতন কাশীর ওপরে পাশবিক আঘাত হানেন কুতুব-উদ্-দিন আইবেক, ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মুহম্মদ ঘুরীর প্রিয় সেনাপতি।

এইসময় কাশীর রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজের শ্বশুর কনৌজরাজ জয়চন্দ্র। জামাইকে শায়েস্তা করার জন্য তিনিই মুহম্মদ ঘুরীকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯৩ খ্রীঃ) জয়লাভের অনতিকাল পরেই মুহম্মদ ঘুরী কনৌজ আক্রমণ করেন। দেশদ্রোহী জয়চন্দ্র নিহত হয়। তখন কাশী কনৌজ রাজ্যের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য আইবেক বিশ্বনাথ মন্দির লুঠ করে সেটি ধ্বংস করেন।

কিছুকালের মধ্যে সেখানেই আবার নতুন মন্দির তৈরি হয়। সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা সুলতানা রাজিয়া মাত্র চার বছর (১২৩৬-৪০) দিল্লীর মসনদে আসীন ছিলেন।

তিনি মহিলা হয়েও তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে সেই মন্দির ভেঙে ফেলেন। এবং তার পাথর দিয়ে পুরনো মন্দিরের জায়গায় মসজিদ তৈরি করেন।

তারপর থেকে প্রায় প্রতি শতাব্দীতে ধর্মান্ধ শাসকগণ কাশীর মন্দির ও মঠ ধ্বংস করে কাশীবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর ফিরোজ শাহ তুঘলক, পঞ্চদশ শতকে জৌনপুরের মাহমুদ শাহ সার্কি, ষোড়শ শতকে সুলতান সিকন্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ)।

তবু কাশীর ধর্মপ্রাণ মানুষ কাশীশ্বরকে বিসর্জন দেন নি। বরং প্রতিবার ধ্বংস করার পরে তাঁরা আরও বড় করে বিশ্বনাথ মন্দির তৈরি করেছেন। এবং এই ষোড়শ শতকের শেষ দিকেই বৃহত্তম বিশ্বনাথ মন্দির নির্মিত হয়। সে মন্দির তৈরি হয় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫)। তাঁর প্রিয় সেনাপতি ও সভাসদ টোডরমল নির্মাণ করান। ১৫৮৫ সালে নির্মাণকার্য শুরু হয়। কয়েক বছরের নিরলস পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ের পরে আটটি মণ্ডপ ও সুবিশাল গর্ভগৃহ সমৃদ্ধ এক অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। কথিত আছে, মহাপণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের আদেশে ও সম্রাটের সক্রিয় সহযোগিতায় টোডরমল সেই মন্দির তৈরি রিয়েছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা বিশ্বনাথ মন্দিরের সেই গৌরব একশ' বছরও স্থায়ী হয় নি। সম্রাট আকবরের অযোগ্য বংশধর আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ সালে সে মন্দির ধ্বংস করেন। মন্দিরটির অর্ধেক ভেঙে ফেলে বাকি অর্ধেককে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। সেটাই বর্তমানের জ্ঞানবাপীর মসজিদ।.....

সুধাংশু সহসা বলে ওঠে—আওরেঙ্গজেবের সৈন্যবা কি লিঙ্গমমূর্তিকে কলুষিসিত করতে পেরেছিল?

—না। কারণ কিছুক্ষণ আগে পূজারী খবরটা পেয়েছিলেন। অথচ তখন লিঙ্গমূর্তিকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবারও সময় ছিল না। তাই জ্যোতির্লিঙ্গকে সুগভীর কূপ জ্ঞানবাপীর জলে ফেলে দেওয়া হল। সম্রাটের সৈন্যরা সংবাদটা জানতে পারলেন। কিন্তু সেই গভীর কূপে নেমে কেউ জ্যোতির্লিঙ্গকে তুলে আনতে সাহসী হলেন না। তাছাড়া লুঠপাটের জন্য তাঁদের হাতে সে সময়ও ছিল না। সুতরাং তাঁরা জ্ঞানবাপীর জল কলুষিত করেই নিরস্ত হলেন।

আমি থামতেই মনোরঞ্জন বলে ওঠে—-কিন্তু শঙ্কুদা, আপনি কালাপাহাড়ের কথা কিছু বললেন না?

—বললাম না, কারণ বলতে চাইছি না।

—কেন?

—প্রথমত কালাপাহাড় বাঙালী, দ্বিতীয়ত তিনি হিন্দু।

—তাহলেও বলুন।

—কিন্তু তাহলে যে আরও একজনের কথা বলতে হবে।

—কার কথা?

—কুতুব-উদ্-দিন আইবেক অর্থাৎ দিল্লীর প্রথম সুলতানের কথা। কারণ অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনিও হিন্দু ছিলেন। হোসেন নিজামীর ইতিহাস এবং কর্নেল

ব্রিগ্‌স-এর অনুবাদ* থেকে জানা যায় কুতুবের পিতৃদত্ত নাম রামপ্রসাদ। তাঁর পিতা পাঞ্জাবের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়। পাঞ্জাব অধিকার করার সময় মহম্মদ ঘুরী তাঁকে বন্দী করে একজন গোলাম করে নেন। বাধ্য হয়ে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে নিজের কাজে দক্ষতা দেখিয়ে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে মুহম্মদ তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কেবল কাশী নয়, অযোধ্যা ও প্রয়াগেও তিনি শত শত মন্দির ধ্বংস করে হাজারহাজার মানুষ মেরে ফেলেছেন। তিনিই কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করেন। কাশীতে সহস্রাধিক মন্দির ধ্বংস করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেন।

মুহম্মদ ঘুরী তাঁকে আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ১২০৬ সালে দেশে রওনা হন। পথে কাংড়া ও কাশ্মীর সীমান্তে জনৈক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। কুতুব তখন প্রভুর ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নেন। ১২০৮ সালে তিনি নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ১২১০ সালে তিনি মারা যান।

—এবারে কালাপাহাড়ের কথা বলো জেঠু! শ্রীমান অপু সুধাংশুর ছেলে, সুতরাং তার স্মরণশক্তি খারাপ হবার কথা নয়। সে আমাকে মূল-প্রসঙ্গটিব কথা মনে কবিয়ে দেয়।

অতএব আবার আরম্ভ করতে হয়—কালাপাহাডেব আগের নাম কালাচাঁদ বায়। রাজশাহী জেলার বীরজাওন গ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁব জন্ম। তাঁরা ভাদুড়ী। তিনি বাংলা ও পারসী ভাষা বেশ ভাল জানতেন। কালাচাঁদ ছিলেন বলবান। সেইসঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বারোহণে পারদর্শী। গৌড়ের সুলতান তাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। চাকরিতে উন্নতি করার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে সুলতানের কন্যাকে বিয়ে কবতে হয়। হিন্দুসমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত কবেন। অনেক অনুবোধেব পবেও সমাজপতিরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হন না।

দুঃখিত মনে কালাচাঁদ পুরীতে গিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ধর্ণা দেন। একসপ্তাহ অনাহারে ধর্ণা দেবার পরেও জাগ্রত দেবতা নীরব রইলেন, কোন দৈববানী হল না। পাণ্ডারা তাঁকে যার-পর-নেই অপমান করলেন।

ক্ষুব্ধ কালাচাঁদ ফিরে গেলেন গৌড়। তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন। সুলতানের অনুমতি নিয়ে উড়িষ্যা আক্রমণ করলেন। পথের সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে পুরী পৌঁছলেন। জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহ পুড়িয়ে দিয়ে মন্দিরের বহুমূর্তি ভেঙে ফেললেন। তারপরে পাণ্ডাদের ধরে ধবে মুসলমান করতে থাকলেন। অত্যাচাবিতরা কালাচাঁদকে কালাপাহাড় বলতে থাকলেন। শুনতে পেয়ে তিনি রেগে গিয়ে আরও বেশি অত্যাচার শুরু করে দিলেন।

শ্রীক্ষেত্র ধ্বংস কবে কালাচাঁদ কামাখ্যা ছুটলেন। সেখানে গিয়েও একই রকম অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা চালালেন। ফেরার পথে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সমস্ত বড় মন্দির ধ্বংস করলেন।

---

* Translation From Farishta (Vol. 1, P. 179) by Colonel Briggs.

হিন্দু কালাচাঁদের হিন্দু বিদ্বেষের কথা তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময় দিল্লীর সুলতান বাহলুল লোদীর (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রীঃ) সঙ্গে জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শার্কের যুদ্ধ চলছিল। তাঁরা দুজনেই কালাচাঁদকে দলে পেতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে প্রথম আমন্ত্রণ জানালেন হোসেন শাহ। কালাচাঁদ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে গৌড় থেকে জৌনপুর রওনা হলেন।

খবরটা লোদীর কাছে পৌঁছল। তিনি কৌশলে মধ্যপথ থেকে কাঁলাচাদকে দিল্লী নিয়ে এলেন। এর আগে তিনবার বিয়ে করেছেন জেনেও লোদী তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। কালাচাঁদের সাহায্যে ১৪৯৩ সালে জৌনপুর অধিকার করলেন।

তারপরেই কালাচাঁদের মনে পড়ল কাশীর কথা। সসৈন্যে কাশী এসে একটার পর একটা মন্দির ধ্বংস করে বিগ্রহ বিনষ্ট করতে থাকলেন, সেইসঙ্গে কাশীবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার।

এইসময় কালাচাঁদের মাসীমা বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হয়েছিলেন। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে তিনি একদিন রাতে ছুটে এলেন কালাপাহাড়ের শিবিরে। কালাচাঁদ চিনতে পারলেন তাঁকে। প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বধর্মদ্বেষী নিষ্ঠুর কালাপাহাড়কে তিনি যার-পর-নেই গালাগালি করলেন। কালাপাহাড় রেগে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছু করতে পারার আগেই বৃদ্ধা তাঁর কাছে ছুটে এলেন। তাঁর কোমর থেকে ছোড়াখানি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন। তাঁর রক্তে কালাপাহাড়ের শরীর সিক্ত হয়ে গেল।

বাংলার কলঙ্ক ঘোচাতে এক বিধবা বাঙালী বৃদ্ধা বারাণসীতে শহীদ হলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ কালাপাহাড়কে শেষ রক্ত দান করলেন।

তাঁর এই আত্মত্যাগ বিফল হল না। কালাচাঁদের সম্বিত ফিরে এলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের অত্যাচার বন্ধ করে দিল্লী ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। তারপরে সবার অলক্ষ্যে সেই রাতেই একাকী শিবির থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরদিন তাঁর সৈন্যরা তাঁকে না পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

কেউ বলেন, অনুতপ্ত কালাচাঁদ সেই রাতেই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার কেউবা বলেন, তিনি হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপন করে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু তার আগেই কালাপাহাড় কেবল কেদারেশ্বরের মন্দিরটি ছাড়া কাশীর অন্যসব মন্দির ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। এবং কুতুব ও কালাপাহাড় হিন্দু হয়েও হিন্দুতীর্থ কাশীর যা ক্ষতি করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন ধর্মান্ধ শাসক তা করতে পারেন নি।

।। চার ।।

আজানের সুরে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাই। জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে ঘর ভরে দিয়েছে। মনে পড়ে সবকথা। গতকাল কাশী এসেছি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের যাত্রীনিবাসে উঠেছি। সন্ধ্যায় বাবা বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করেছি। কাশীবাসের প্রথম রাতটি আনন্দে অতিবাহিত হয়েছে।

আজানের সুরে ঘুম ভাঙায় বিস্ময়ের কিছু নেই। কাশীতে যেমন অনেক মন্দির, তেমনি বহু মসজিদ। এবং তা বহুবছর ধরেই। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত জেম্স প্রিন্সেপ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন কাশীতে যেমন হাজারখানেক মন্দির ছিল, তেমনি ছিল তিনশ' তেত্রিশটি মসজিদ। বলা বাহুল্য বিগত দেড় শতাধিক বছরে মন্দির-মসজিদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি তাদের উন্নতিও হয়েছে। যেমন মন্দিরের চুড়োয় আর মসজিদের মিনারে 'লাউড-স্পীকার' লাগানো হয়েছে। ভজন আর আজানের জন্য মৌজ-মতো মৌঘুম শেষ করার উপায় নেই একালের কাশীতে।

না থাকুক। আমরা তো মৌঘুমের মায়ায় কাশী আসি নি। তা ছাড়া আজ আমাদের অনেক কাজ। স্বামীজিদের কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেতে হবে হোটেলে। তারপরে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে নিতে হবে। এগারোটায় গাড়ি আসবে। আমরা আজ কাশী দর্শনে বের হবো।

বাথরুম সেরে এসে ছেলেদের জাগিয়ে দিই। ঘরে ঘরে গিয়ে ওদের বাপ-মাদেরও ঘুম ভাঙাই। তারপরে এসে দাঁড়াই সামনের বারান্দায়।

আজানের সুর গিয়েছে থেমে। সংঘের মন্দির থেকে কাঁসর ও ঘন্টার শব্দ আসছে ভেসে। মঙ্গলারতি শুরু হয়েছে। আর্তের সেবা ভারত সেবাশ্রম সংঘের একমাত্র ধর্ম। তাই এঁদের মূল-মন্দিরে সেবাধর্মের শাশ্বত বিগ্রহ আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর মূর্তি অথবা চিত্র। তাঁরই সামনে শুরু হয়েছে আরতি। মানবের মঙ্গলের জন্য মহামানবের মঙ্গলারতি।

দোতলার এই বারান্দা থেকে প্রায় সারা আশ্রমটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভারী সুন্দর। যাত্রীনিবাসের সামনে চমৎকার ফুলবাগান। আর তার ডাইনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আশ্রমের সব্জিক্ষেত, এই ক্ষেতের সব্জি দিয়েই মোটামুটি আশ্রমের চাহিদা মিটে যায়।

ফুল বাগানের পরে বেশ উঁচু দেওয়াল। ওপাশে আশ্রম। পুরনো ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মন্দির-আশ্রম ও পাঠাগার। বন্যাত্রাণ ও হরিজনদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মও হয় এখান থেকে।

সুবিরাট এলাকা নিয়ে সংঘের এই কেন্দ্র। অবস্থানটিও সুন্দর, একেবারে বিদ্যাপীঠ রোডের ওপরে, ক্যান্ট্ স্টেশনের বেশ কাছে। কেবল বিশ্বনাথ মন্দির একটু দূরে পড়ে যায়। কিন্তু যাতায়াতের ঝামেলাটুকু সয়ে নিলে এমন খোলামেলা আশ্রয়ে

কাশীবাস রীতিমত ভাগ্যের কথা।

আগেই বলেছি, মসজিদের আজান থেমে গিয়েছে, শুরু হয়েছে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। এই দুই মিলেই তো ভারতের সংহতি। হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের আদর্শ নগরী বারাণসী। তবু মাঝে মাঝে সংকীর্ণতার শিকার হতে হয় নাগরিকদের। এর চেয়ে বড় বেদনা আর কি হতে পারে?

কিন্তু থাক্‌গে এসব ভাবনা। তার চেয়ে মন্দিরে গিয়ে একটু মঙ্গলারতি দেখে আসা যাক। এবারে কাশীতে আজই আমার প্রথম সকাল। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নেমে আসি নিচে। যাত্রীনিবাসের বাগান পেরিয়ে আশ্রম এলাকায় আসি। কয়েকপা এগিয়েই ডানদিকে মন্দির, সামনে আশ্রম ও অফিস।

মন্দিরে মঙ্গলারতি চলেছে। আরও কয়েকজন যাত্রী দর্শন করছেন। স্বামীজিরাও এসেছেন। এসেছেন সদাশিবানন্দজী ও সুধাংশু মহারাজ। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও আরতি দর্শন করতে থাকি। গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মন্দিরে দেবারতি দর্শন করেছি আর আজ সকালে সেবাশ্রম মন্দিরে সেবাধর্মের মহামানব আচার্য প্রণবানন্দজীর উদ্দেশে সেবকদের শ্রদ্ধারতি দর্শন করছি। দুই-ই মনে রাখবার মতো।

গতকাল শুনেছি মানুষরূপী দেবতার জন্য মানুষের ভক্তিগীতি আর আজ দেখছি দেবতারূপী মানুষের উদ্দেশে মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। গতকাল অভিভূত হয়েছি, আজ আনন্দিত হচ্ছি। 'জীবে সেবা' যাঁদের জীবনের সাধনা তাঁদের মন্দির-দ্বারে দাঁড়িয়ে আমিও সেই মানবপূজারী প্রণবানন্দকে পুনরায় প্রণাম করি।

আরতি শেষ হবার পরে স্বামীজি বলেন—কাল এলেন, আর আজই চলে যাচ্ছেন! সত্যি বড্ড খাবাপ লাগছে।

সুধাংশু মহাবাজ যোগ করেন—আমাদের এখানে তো অনেক ঘর, তার মধ্যে মাত্র চারখানি আপনাদেব দেওয়া হয়েছে। এতে সুধাংশুবাবু কেন নিজেকে এমন অপরাধী বোধ করছেন, বুঝতে পারছি না।

আগে ঠিক ছিল চলে যাবার কথাটা আজ সকালে বলা হবে। কিন্তু কথায় কথায় কথাটা কালই সুধাংশু বলে দিয়েছে। সবই বলেছে। আমি তাই জবাব দিই—ওরা বলছে হোটেলে থাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি আপনাদের যাত্রীনিবাসের ঘর দখল করে রাখি, তাহলে দরিদ্র যাত্রীদের বঞ্চনা করা হবে।

—কিন্তু ঐ চারখানি ঘর পেলেই কি দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি আগামীকাল সকালে এলেও দেখবেন আজকের মতই কিছু যাত্রী মন্দির ও অফিসের বারান্দায় রাতের আশ্রয় নিয়েছেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু সুধাংশু এসব কথা শুনবে না। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে সবিনয়ে বলি—চলুন, অফিসে গিয়ে বসা যাক। আমার সহযাত্রীদের বিছানা ছাড়তে আরও খানিকটা সময় লাগবে। এই অবসরে আপনাদের কাছ থেকে আচার্য প্রণবানন্দজীর অমৃতময় মহাজীবনের কিছু কথা শোনা যাক।

অফিসে এসে বসতেই স্বামীজি একজন সেবককে আমার জন্য চা আনতে বলেন। তারপরে শুরু করেন—

আমাদের সংঘের সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ 'শতাব্দীর নবজাগরণ

ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ' নামে ছোট একখানি পুস্তিকা প্রনয়ণ করেছেন। এই বইখানি পড়লে আপনি মোটামুটি গুরুমহারাজকে জানতে পারবেন। বইখানি আপনি আমাদের কলকাতা আশ্রমে পেয়ে যাবেন। আমি সেই বই থেকে কিছু কথা বলে আপনার কাছে আচার্যদেবের মহাজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

আমি মাথা নাড়ি। সদাশিবানন্দজী বলতে থাকেন—আপনি জানেন যে ঊনবিংশ শতাব্দী হল বাংলার নবজাগরণের যুগ। ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আঠারোশ' আটত্রিশে বঙ্কিমচন্দ্র, চুয়াল্লিশে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আটচল্লিশে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আটান্ন-তে আচার্য জগদীশচন্দ্র, একষট্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, তেষট্টিতে বিবেকানন্দ, সত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাহাত্তরে ঋষি অরবিন্দ আর সাতানব্বইতে সুভাষচন্দ্র।

একবার থামেন স্বামীজি, তারপরে আবার বলতে থাকেন—আমাদের আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজও ঊনবিংশ শতকেই আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রদোষকালে ১৮৯৬ সালে। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছেন। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ লিখেছেন—'ঊনবিংশ শতাব্দীর উপান্তে আবির্ভূত এই যুগাচার্যের শিক্ষা, সাধনা, সিদ্ধি, সংঘগঠন এবং সেই সংঘের মাধ্যমে বিরাট ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ বস্তুত বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার।'

আপনি জানেন যে ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দজীর অকাল মহাপ্রয়াণের পরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমেই ব্যাপকতর হতে থাকে। ফলে ঊনবিংশ শতকের ধর্মীয় সামাজিক ও জাতীয় সমস্যাগুলো ক্রমেই জটিলতর আকার ধারণ করতে থাকল। প্রয়োজন দেখা দিল আরেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের, যিনি মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব সমস্যাগুলোকে বাস্তবসম্মত উপায়েই সমাধান করার চেষ্টায় ব্রতী হবেন। এবং সেইসঙ্গে জাতির সামনে যুগোচিত পন্থার নির্দেশ দান করবেন। এখানেই আমরা পেলাম প্রাতঃস্মরণীয় প্রণবানন্দজী মহারাজকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরে তাঁর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল বলেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই সংগ্রামী মহাপুরুষের মহাজীবনও শঙ্করাচার্য এবং বিবেকানন্দের মতো স্বল্পায়ু। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর কর্মময় মহাজীবনের অবসান হয়েছে।

১৯১৩ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রণবানন্দ যোগীরাজ বাবা গম্ভীরনাথজীর কাছে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। তরুণ তাপস তিনবছর পরে ১৯১৬ সালে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়—এযুগ মহাজাগরণের যুগ। চাই মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তি।

তিনি বলেছেন, এই লক্ষ্য সাধনের ধর্ম হল ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য। তাঁর মতে আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতিই প্রকৃত জীবন, আত্মবিস্মৃতিই মহামৃত্যু। বীরত্ব পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব হচ্ছে মহাপুণ্য আর কাপুরুষতা সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা হল মহাপাপ। উদ্যম উৎসাহ ও অধ্যাবসায় মানুষের মহামিত্র আর আলস্য নিদ্রা ও জড়তা মহাশত্রু।

আচার্যদেব বলেছেন, বৈদিকযুগের আদর্শ আর বৌদ্ধযুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর সংঘ। ভারত সেবাশ্রম সংঘ হবে বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় সংঘ।

তিনি কারও প্রত্যয়ে আঘাত করেন নি, কিন্তু সকল প্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহকে একত্রিত করে জাতীয় ঐক্যের ভিৎ তৈরি করে গিয়েছেন। স্বামী নির্মলানন্দ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—প্রণবানন্দজী যোগাচারে ছিলেন নাথপন্থী শৈব, আদর্শে রামচন্দ্র, সংঘ সৃষ্টিতে স্বয়ং বুদ্ধদেব, ধর্মসংস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ, সন্ন্যাসে শঙ্করপন্থী বৈদান্তিক আর প্রেমে শ্রীচৈতন্য।

তিনি ছিলেন একদিকে জীবকরুণার মাধুর্য, আরেকদিকে আত্মিক মহাশক্তির শৌর্য। তিনি আর্ত মানবের সেবায় যেমন জীবন দান করতে পারতেন, তেমনি এক চড়ে দুর্বৃত্তের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার শক্তি ছিল তাঁর শরীরে। ধর্মকে তিনি মন্দিরের চার দেওয়ালের ভেতরে বন্দী করে রাখেন নি, ধর্মের ভিত্তিতে এক অখণ্ড ও শক্তিশালী জাতি গঠন করতে চেয়েছেন।

তিনি বার বার বলেছেন—পতিতকে পবিত্রাণ করো, বিপন্নকে রক্ষা করো, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও। বলতেন— লোকে তুলসীর মালা হাতে নিয়ে নামজপ করেন আর আমি জপ করি, ব্যক্তি গঠন পরিবার গঠন সমাজ গঠন ও জাতি গঠন। তিনি স্কুল কলেজের ছাত্রদের ডাক দিয়েছেন শক্তি সাধনায় দীক্ষা নিতে ও চরিত্রগঠনের মন্ত্র গ্রহণ করতে। গৃহীদের বলেছেন, দীক্ষা নিয়ে সাধনার সাহায্যে শুচিশুদ্ধ দাম্পত্য জীবনের আনন্দ আস্বাদন করতে।

আচার্যদেব তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন সমাজের নিচুতলার মানুষদের মাঝে। যারা অবহেলিত অশিক্ষিত ও অস্পৃশ্য তাঁদের তিনি বুকে টেনে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি নিঃস্ব চাষীদের চাষের মূলধন যোগাড় করে দিয়েছেন, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছেন, পাণ্ডাদের অত্যাচার থেকে তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করেছেন। বড় বড় ধর্মীয় মেলাগুলিতে নিজে উপস্থিত হয়ে সেবাকার্যের মাধ্যমে সেগুলিকে জাতীয়মেলায় রূপান্তরিত করেছেন। তিনি শিশুদের পাঠশালা, বালকদের বিদ্যালয় ও রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সম্পর্কে প্রখ্যাত পণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অভিনব পন্থায় অতি দ্রুত ও স্বাভাবিক ভাবে....উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে.....অস্পৃশ্যতা ও অনাচারের প্রতিকার করিয়াছিলেন।....বর্তমান যুগেও দেখিতেছি সংঘনেতা স্বামী প্রণবানন্দজী ঠিক এ যুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উদ্ভাবনপূর্বক অতি দ্রুত অথচ অতি স্বাভাবিক ভাবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর....মধ্যে....অস্পৃশ্যতা ও অনাচারের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আবার একটু থামলেন স্বামীজি। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। মৃদু হেসে তিনি আবার শুরু করেন—গুরুমহারাজ ছিলেন সত্যাশ্রয়ী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাই ১৯৩৪ সালে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তা পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয়জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেছেন—'মিলন হয় সবলে সবলে, সবলে দুর্বলে কদাচ নয়। মুসলমান ও খৃষ্টান সংখ্যালঘু হয়েও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী; হিন্দু সংখ্যাধিক্য হয়েও অসংগঠিত; সুতরাং দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। হিন্দু যেদিন

মুসলমান ও খৃষ্টানের ন্যায় সুসংগঠিত হবে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানের যথার্থ মিলন ও ঐক্য হবে সেই দিন, তৎপূর্বে নয়।'

আচার্যদেব বিশ্বাস করতেন যে, 'হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন ও ঐক্য যত দ্রুত সম্পাদিত হবে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানের মিলন ও ঐক্য তত সত্বর এগিয়ে যাবে।'

তাই প্রণবানন্দ পাঁচ লক্ষ রক্ষীসেনার বাহিনী গঠন করে তাঁদের হাতে আত্মরক্ষার হাতিয়ার তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর সংগ্রাম ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় সামাজিক ও জাতীয় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন—'আর পাঁচটা বছর বেঁচে গেলে বাংলার চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।'

দুর্ভাগ্য আমাদের। এর পরে তিনি দুটি বছরও বাংলার মাটিতে বাস করতে পারেন নি। শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁকেও অকালে দেহত্যাগ করতে হয়। আগেই বলেছি, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সময়টা ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস।

আমরা বিশ্বাস করি যে গুরুমহারাজ অসময়ে অপ্রকট না হলে ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা হত না। আর সেই দাঙ্গা না হলে ভারতকেও ভাগ করার দরকার পড়ত না।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, আজ স্বাধীনতার এই পঁয়তাল্লিশ বছর পরে আমরা তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। একটা দেশকে তিন ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু কোন ভাগেই শান্তি আসে নি। কারণ ভাগের শেষ নেই। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, Atom is divisible. পরমাণুও বিভাজ্য।

অতএব বিভাজন নয় একত্রীকরণ, বিচ্ছিন্নতা নয় মিলন, প্রতিশোধ নয় ক্ষমা। আচার্যদেব সমগ্র জীবন ধরে সেই সাধনাই করে গিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে। ভারত আবার জগৎসভায় নিজের আসন নিতে পারবে।

তাই আসুন, আমরা সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। স্মরণ করি তাঁর সেই মহামন্ত্র—'জড়বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে, এদেশ সেদেশ নয়। এদেশ চায় নীতি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।'

অবশেষে তাঁকে বলি—হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাযোগী, তোমার যোগবলে তুমি আমাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাও। তুমি আমাদের মানুষ করে তোলো।

॥ পাঁচ ॥

হোটেল যমুনায় এসে গোছগাছ সেরে নেওয়া গেল। আগেই বলেছি, হোটেলটি গোধুলিয়ার কাছে, লাক্সা রোডের ওপরে। নিচের তলায় সামনের দিকে একখানি স্টেশনারী-কাম-কিউরিও শপ্ আর কার-পার্ক। পেছনে হোটেলের রিসেপশান এবং খানদুয়েক ঘর। কার-পার্কের পাশ দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। দোতলায় একদিকে রেস্তোরা-কাম-ডাইনিং হল ও কিচেন। আরেকদিকে দুই সারিতে ডজনখানেক ডাব্‌ল বেডরুম, মাঝখানে প্রকাণ্ড চওড়া করিডর।

আমরা ডানদিকে পর-পর চারখানি ঘর পেয়েছি। সস্ত্রীক সুধাংশু, মনোরঞ্জন ও ধীরেনের তিনখানি, আর তিন ছেলেকে নিয়ে আমার একখানি। ছেলেদের দেখে মেয়েটাও এঘরে থাকার তাল তুলেছিল। ওর মা-বাবা অনেক কষ্টে ওকে বুঝিয়েছে, দুজনের বিছানায় পাঁচজন শুলে জেঠুর অসুবিধে হবে। শেষ পর্যন্ত বাবলি তার মা-বাবার সঙ্গে ঘুমোতে রাজী হয়েছে। তবে রাতে শোবার আগে পর্যন্ত সে নাকি এ ঘরেই থাকবে। তখন হেসে ধীরেন বলেছে—তুই একা কেন, সে তো আমরাও।

গোছগাছ সেরে নেবার পরে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া করে নেওয়া গেল। তারপরেই গাড়ি চলে এলো, দুখানি অ্যাম্‌বাসেডার। ভাগ করে উঠে বসলাম। কাশীর জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে গাড়ি চলল এগিয়ে। আজ আমরা কাশী দর্শনে বের হয়েছি। চলমান গাড়িতে বসে কাশীর কথাই ভাবতে থাকি।

প্রাচীন ইতিহাস জানা না গেলেও এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে বিশ্বের প্রাচীনতম মহানগরী সমূহের অন্যতমা এই কাশী। আর্যসভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই কাশীর প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণ দুর্নিবার।

সেকালের কাশী বিশেষ করে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু কথা আমরা জানতে পারি 'কাশীখণ্ড' এবং 'কাশীরহস্য' নামে দুখানি গ্রন্থ থেকে। সেই বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে সেকালের সঙ্গে একালের কাশীর মিল সামান্যই। সেকালের পাহাড় একালে বাড়ি-ঘরে ভরে গিয়েছে, নদী-নালা গিয়েছে মজে, গঙ্গাও গেছে বদলে। সেকালের কোন মন্দিরই একালে আর পুরনো জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

বিশ্বের একটি প্রাচীনতম মহানগরী হয়েও একালের কাশীর প্রকৃত পত্তন হয়েছে অষ্টাদশ শতকে, অর্থাৎ বৃটিশ যুগে। কারণ তার আগে মুসলমান রাজত্বকালে পাঁচশ' বছর ধরে কাশীতে ক্রমাগত ধ্বংসলীলা চলেছে। কিন্তু নগরজীবনে যা-ই ঘটে থাকুক, সমাজজীবনে প্রাচীন সংস্কৃতি আর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আজও রয়েছে বেঁচে।

শিল্প এবং স্থাপত্যেও সেই সুপ্রাচীন প্রভাব টিকে আছে। তাই আজও মাঝে মাঝে পথের পাশে মৌর্যযুগের মানে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর স্থাপত্যকলা দেখতে পাচ্ছি। এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণার একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এখন পর্যন্ত রাজঘাট ছাড়া আর কোথাও খননকার্য চালানো হয় নি।

আরেকটা কথা ভেবে অবাক হতে হয়। এতবার ধ্বংস করার পরেও কাশীতে

এত মন্দির গড়ে উঠেছে যে কোন তীর্থযাত্রীর পক্ষেই সব মন্দির দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ সেকালের চেয়ে একালের কাশী আরও বড়, আরও সুন্দর এবং আরও পুণ্যময় হয়ে অগণিত ভক্তবৃন্দের ভিড়ে সারাবছর ভরে থাকছে।......

—কি ভাবছ জেঠু? অপুর প্রশ্নে আমার ভাবনা থেমে যায়।

হেসে উত্তর দিই—কি আর ভাবব ব'লো! কাশীর পথে বেরিয়ে, কাশীর কথাই ভাবছিলাম মনে মনে।

—মনে মনে না ভেবে, একটু মুখে বলুন না দাদা! তাহলে আমরাও আপনার ভাবনার অংশীদার হতে পারি।

টুকুর কথা শুনে মনোরঞ্জন তাকে বলে—সাব্বাস! চমৎকার প্রস্তাব করেছো। আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

অতএব আমাকে শুরু করতে হয়—কাশী একটি বিশাল সুন্দর ও সুমহান মহানগরী। দক্ষিণ-প্রবাহিনী গঙ্গা এখানে এসে সহসা উত্তর-প্রবাহিনী হয়েছে। সেখানেই গঙ্গার পশ্চিমতীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মহানগরী বারাণসী। বিদেশী লেখক-লেখিকারাও গঙ্গাবক্ষে বসে কাশীর মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছেন। জনৈক বিদেশী লেখক লিখেছেন—"There is little in the world to compare with the splendor of Banaras, seen from the river at dawn."

যেকোন সৌন্দর্যপিপাসুর কাছেই গঙ্গাবক্ষ থেকে প্রভাতী কাশীর রূপ অতুলনীয়। সূর্যের সোনালী আলো পাল্লা করে যেন একটি বাড়ির পরে আরেকটি বাড়িকে উজ্জ্বল করে তুলছে। মনে হয় জনপদ নয়, আলোর নগরী, 'সিটি অব্ লাইট'।

কাশীর গঙ্গাতীরে সত্তরটির ওপরে স্নানের ঘাট রয়েছে। দক্ষিণের অসিঘাট থেকে উত্তরের আদিকেশব বা রাজঘাট পর্যন্ত তাদের বিস্তার। সারাবছর সারাদিন ধরে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এইসব ঘাটে অবগাহন করে অপার আনন্দ লাভ করছেন।

শুধু ঘাট নয়, গঙ্গাতীরে বহু বড়-বড় মন্দির আর আশ্রম রয়েছে। এদের মধ্যে কেদারেশ্বর মন্দির ও আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম অন্যতম। আর আছে দুটি শ্মশান, হরিশ্চন্দ্র ও মণিকর্ণিকা। কাশীতে মৃত্যু হলে শিবলোকে গমন আর হরিশ্চন্দ্র কিম্বা মণিকর্ণিকায় যদি দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়, তাহলে অবশ্যই মোক্ষলাভ।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই মহানগরী এই উপমহাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হয়ে রয়েছে। আপন আপন ধর্মের কথা শোনাতে বুদ্ধদেব, মহাবীর ও শঙ্করাচার্য কাশী এসেছেন। যুগাতীতকাল ধরে দলে দলে শিক্ষার্থী বেদশিক্ষা করতে এখানে আসছেন। আসমুদ্র হিমাচল থেকে মানুষ তাঁদের পিতা-মাতার অস্থি কিম্বা চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে কাশীর গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াচ্ছেন। সংখ্যাতীত সন্ন্যাসীর পদধূলিধন্য এই মহানগরী। এখনও কাশী বহু মানুষের বার্ধক্য-বারাণসী। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন কাশীতে দেহত্যাগ করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ।

আর তাই শত আঘাতের পরেও কাশী বেঁচে রয়েছে। এখানেই বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন নগরীর সঙ্গে কাশীর পার্থক্য। এ সম্পর্কে এম. এ. শেরিং নামে জনৈক মিশনারী প্রায় দেড়শ' বছর আগেই লিখে গিয়েছেন—"Twentyfive centuries ago, at least, it was famous when Babylon was struggling...when Tyre

was planting her colonies, when Athens was growing in strength, before Rome had become known, or Greece had contended with Persia or Nebuchandnezzar had captured Jerusalem, she hau aiready risen to greatness...."

বিশ্ববরেণ্য সুসাহিত্যিক মার্ক টোয়াইন প্রায় একই কথা লিখেছেন....

—কি লিখেছেন জেঠু? শান্ত অপু অশান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

একটু হেসে বলি—লিখেছেন, "Beneres is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together."

অন্যান্য প্রাচীন মহানগরীর সঙ্গে কাশীর আরও একটি পার্থক্য রয়েছে। কাশীর নাগরিক জীবন সেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে আজ পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস কিম্বা রোমের কলোসিয়াম আজ মৃত কিন্তু বিশ্বনাথ মন্দির এখন আরও বেশি প্রাণময়। তাছাড়া কাশীবাসীদের জীবনধারা মোটামুটিভাবে সেই একই খাতে বয়ে চলেছে। কাশী হচ্ছে সেই মহানগরী যেখানে সুপ্রাচীন কালে একটি সমগ্র জাতি তার সকল শক্তি দিয়ে যে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল, তা আজও বহমান। একবার ক্রুসেডের সময় জনৈক পোপ বলেছিলেন—জেরুজালেম হল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। আমরা হিন্দুরাও মনে করি, কাশী হল বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রভূমি।

একদিন খুব সকালে তোমরা যদি নৌকোয় চড়ে গঙ্গাবক্ষ থেকে কাশীর দিকে তাকাও, তাহলে সারা ভারতকে কাশীর মধ্যে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিস্ময়কর সহাবস্থান। হরিশ্চন্দ্র আর মণিকর্ণিকার ধোঁয়া কাছের কোন মন্দিরচূড়ার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে আর জীবন ও মৃত্যুর সেই ছায়া পতিতপাবনী গঙ্গার বুকে প্রতিফলিত।

...কিন্তু থাক্। এখন আর কাশীর কথা নয়, আমরা তুলসীমানস মন্দিরের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। এসো, দর্শন করে নেওয়া যাক্।

নেমে আসি গাড়ি থেকে। ওদের গাড়ি আগেই এসেছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ওদের কাছে আসতেই অপু বলে ওঠে—ভালই হয়েছে, তোমরা ঐ গাড়িতে রয়েছো। জেঠু কাশীর কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলছে।

—আমাদের বলবে না জেঠু? বাবু ও বাবলি একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

—বলব বৈকি! হোটেলে ফিরে চলো, আরও অনেক ভাল-ভাল গল্প আছে।

—আমি তোমার গাড়িতে যাবো জেঠু। শ্রীমান বাবলা ইতিমধ্যে এসে আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সে আমার স্তোকবাক্যে মোটেই মোহিত হয় নি। সোজাসুজি আমার সঙ্গী হবার প্রস্তাব পেশ করেছে।

মাথা নেড়ে ওর হাত ধরে সবার পেছনে মানসমন্দিরের গেট পেরিয়ে আসি। কিন্তু আগে বলে নেওয়া দরকার যে গোধুলিয়া থেকে দুর্গাকুণ্ড রোড ধরে আমরা দক্ষিণ-সহরতলীতে এসেছি। পথে পড়েছে দুর্গাবাড়ি। ফেরার পথে দর্শন করব। এর পরেই বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ জায়গাটার নাম ভেলুপুরা।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম, আমরা দল বেঁধে গেট পার হয়ে মন্দির এলাকায়

প্রবেশ করেছি। মুখে বলছি তুলসীমানস মন্দির। কিন্তু পুরো নাম শ্রীসত্যনারায়ণ তুলসীমানস মন্দির।

ভেতরে ঢুকে একফালি বাঁধানো অঙ্গন। আঙ্গিনার ডানদিকে বাগান, সামনে মন্দির। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছে এই অনিন্দ্যসুন্দর সুবিশাল মন্দির। এটি বারাণসীর বৃহত্তম মন্দির। আগাগোড়া উজ্জ্বল শ্বেতপাথরে তৈরি। এত সাদা যে অনেকে 'বিমলা মন্দির' বলে থাকেন। বলা বাহুল্য মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নির্মিত হয়েছে এই মন্দির। ১৯৭৪ সালে মহাসমারোহে এখানে কবির চারশত জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়েছে। তখন এখানে কাশীর ১০৮ জন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে প্রতিদিন রামচরিতমানস পাঠ করতেন।



তিন ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে আমি মন্দিরে না ঢুকে বাগানের দিকে এগিয়ে চলি। বাধ্য হয়ে ওদের বাপ-মায়েরাও অনুসরণ করে আমাদের। বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াই। নানা জাতের পাম গাছের সারি আর বিভিন্ন ফুল ও ফলের ভারী সুন্দর বাগান। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ রয়েছে এখানে। সবারই ভাল লাগে বাগানটি। তবু ধীরেন বলে—চলুন, এবারে মন্দিরে যাওয়া যাক্।

শিল্পী মানুষ। স্বভাবতই শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির দর্শনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। তবু বলি—মন্দিরে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বাবলাকে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কেবল বাবলা নয়। চার ছেলে-মেয়েই আমার দিকে তাকায়। আমি বলি—বাগানে বেড়ার এই খুঁটিগুলোকে ভাল করে দেখে নাও। তারপরে ব'লো দেখি এগুলো কি?

ওরা দেখে। কেবল ওরা নয়, বড়রাও।

একটু বাদে বাবলা বলে ওঠে—জেঠু যেন কি? এটা বলতে পারব না? এগুলো তো গাছের গুঁড়ি, তার মানে কাঠ।

সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন করে তাকে।

—এবারে হাত দিয়ে ধরে দেখো তো!

সঙ্গে সঙ্গে হাত লাগায় সবাই। এবং একটু বাদে সমস্বরে বলে ওঠে—না, না, কাঠ নয়, পাথর।

ব্যাপারটা সত্যিই অবাক হবার মতো। খুঁটিগুলোর রঙ ও গড়ন অবিকল গাছের গুঁড়ির মতো। আমিও প্রথম দেখে ওদের মতই অবাক হয়েছিলাম।

বাগান দেখে ফিরে আসি মন্দিরের সামনে। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, উঠে আসি মন্দিরদ্বারে। সঙ্গে সঙ্গে রাম-চরিতমানসের সুললিত সঙ্গীত কানে আসে। সামনেই হারমনিয়াম বাজিয়ে জনৈক গায়ক গেয়ে চলেছেন। আর সেই ভক্তিগীতি স্বর্গীয় সুরের পরশে সারা মন্দিরখানিকে পবিত্র করে তুলেছে।

আমরা এগিয়ে চলি ভেতরে। সারিবদ্ধ সুদৃশ্য স্তম্ভযুক্ত সুবিশাল নাটমন্দির। প্রথমেই বসে রয়েছেন নামাবলী গায়ে দিয়ে জনৈক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। বসে বসে রাম-চরিত মানসের পাতা ওল্টাচ্ছেন আর মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে 'রাম' 'রাম' বলে উঠছেন।

যন্ত্রচালিত বলেই বোধ করি এটি পাথরের মূর্তি নয়, প্লাস্টিকের। কিন্তু ভারী সুন্দর। মনে হচ্ছে মূর্তি নয়, রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ। মূর্তিটি দেখে আমার লণ্ডনের 'মাদাম তুসড' মিউজিয়ামের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে অবশ্য সবই মোমের মূর্তি আর তারা যন্ত্রচালিত নয়।

আমরা মন্দির দর্শন শুরু করি। চারিদিকের দেওয়ালেই রাম-চরিত মানস খোদিত, সেই সঙ্গে রঙীন পাথরে বিভিন্ন রামলীলার ছবি—হরধনু ভঙ্গ, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বনবাসের পথে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা ত্যাগ, রাবণের সীতাহরণ, মৃত্যুপথযাত্রী জটায়ু ইত্যাদি আরও বহু চিত্র। সাধক তুলসীদাস, ভক্ত তুলসীদাস, প্রেমিক তুলসীদাসের অক্ষয় স্মৃতির উপযুক্ত স্মারক।

মনে পড়ছে তুলসীদাসজীর জন্মভূমি রাজাপুরের তুলসী-স্মারক ভবনের কথা। পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থজীর প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছে সেই স্মারক ভবন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি এখন একটি জঙ্গলাকীর্ণ পোড়োবাড়ি।

তাই তো হবে সেটি সরকারী আর এটি বেসরকারী, সেখানে কর্তব্য আর এখানে ভক্তি। সবচেয়ে বড় কথা সেটি রাজাপুরে আর এটি বারাণসীতে। আর এটি জানতেন বলেই বোধ করি রাজাপুরের তুলসীদাস বারাণসী এসেছিলেন। কাশীকেই রাম-চরিতমানসের জন্মভূমি নির্বাচিত করেছিলেন।

সুবিশাল নাটমন্দির পার হয়ে গর্ভমন্দিরের সামনে আসি। মন্দিরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার অপরূপ দণ্ডায়মান বিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের কাছে হনুমানজী নত হয়ে রয়েছেন। আমরাও প্রণাম করি। হিন্দুরাজা রামচন্দ্রকে নয়, মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রজীকে। তাঁকে নিয়ে যতই রাজনীতি করা হোক, তিনি চিরকাল জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষের বরণীয় হয়ে রইবেন।

মূল-মন্দিরের পাশে মা অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এবং সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। দুটি মন্দিরেই শ্বেতপাথরের দণ্ডায়মান অনিন্দ্যসুন্দর সব মূর্তি। আমরা প্রণাম করি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। না, দোতলা বলা উচিত হবে না, তার চেয়ে বলা ভাল উঠে আসি ব্যালকনীতে। নাটমন্দিরের ওপরে চারিদিকেই চওড়া

ব্যালকনী। ঠিক আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে যেমন রয়েছে।

এখানের দেওয়ালেও রামচরিতমানস খোদিত এবং রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কিছু চিত্র। আর ব্যালকনীর রেলিঙের ধারে কাঁচ দেওয়া বুক কেস-এর সারি। ত্র বিভিন্ন সংস্করণের রাম-চরিতমানস সুরক্ষিত। দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই ব্যালকনীর প্রান্তে, ঠিক গর্ভমন্দিরের ওপরে। এখানে রয়েছে রামায়ণের কয়েকটি মডেল মানে বেশ বড় বড় পুতুলের সাহায্যে কয়েকটি রামলীলার বর্ণনা।

আর রয়েছেন তুলসীদাসজী, শ্বেতপাথরের বেশ বড় উপবিষ্ট মূর্তি, ভারী সুন্দর। আমরা প্রণাম করি। আর মনে মনে বলি—হে ভারতীয় সাহিত্যের ভগীরথ, হে সংহতির অগ্রদূত, তুমি রামায়ণকে সংস্কৃত-মুক্ত করে ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে প্রথম পরিবেশন করেছো, তুমি এই নগণ্য লেখকের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো!

—চলুন!

মনোরঞ্জনের কথায় তুলসীদাসজীর ভাবনা যায় হারিয়ে। জিজ্ঞেস করি—কোথায়?

—ঐ যে ওখানে। কি একটা মিউজিয়াম আছে।

হ্যাঁ, রামলীলার কয়েকটি যন্ত্রচালিত মডেল। আলাদা টিকেট কিনতে হবে। তাহলেও যাও, বাচ্চারা খুবই মজা পাবে।

—আপনি? সুধাংশু বলে।

—না, আমি অনেকবার দেখেছি। আজ আর ভেতরে যাবো না। তোমরা দেখে এসো। আমি বরং ততক্ষণ মানস-মন্দিরকে একটু ভাল করে দেখে নিই।

ওরা আর আপত্তি না করে ভেতরে চলে যায়। আমি আবার তুলসীদাসজীর সামনে এসে দাঁড়াই। মনে মনে ভাবতে থাকি সেই মহামানবের কথা, যিনি ইতিহাসকে জয় করেছেন।

কিন্তু তাঁব সেই বিজয় অস্ত্রের নয় রক্তপাতেব নয় হিংসার নয়, সে বিজয় লেখনীব, সে বিজয় প্রেম ভক্তি আর ভালোবাসার। আমি তাঁর মহাজীবনের কথা ভেবে চলি।

প্রথমেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ-এর কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'Akbar the great Mughal' বইতে লিখেছেন—

'The greatest man of his age in India—greater even than Akbar himself, inasmuch as the conquest of the hearts of the minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement more lasting and important than any or all the victories gained by the monarch.'

বলা বাহুল্য সেই কবি তুলসীদাসজী। এবং আজ আমরা সবাই স্বীকার করব আকবরেব দিগ্বিজয়ের চেয়ে তুলসীদাসজীর বিজয় অনেক বড়।

শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন রামচরিতমানস সম্পর্কে বলেছেন—'সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনও গ্রন্থ এতকাল ধরিয়া এত দেশ ব্যাপিয়া এত অধিকসংখ্যক পাঠক-শ্রোতাকে আনন্দ দিয়া যুগপৎ সাহিত্য ও সঙ্গীত রসের

এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির যোগান দিয়া আসিতে পারে নাই।'

রামচরিতমানস ভক্তিকাব্য। ভক্তিবাদ ভারতীয় ধর্মের এক সুপ্রাচীন দর্শন। বুদ্ধদেবের সেবাধর্ম ও শঙ্করাচার্যের শিবপূজার মধ্যেও ভক্তিসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রামানুজ ও তাঁর সহযোগীগণ শঙ্করাচার্যের মতবাদকে অস্বীকার করে ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করেন। তাঁদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের ব্যাপক প্রচার করেন। রামায়ণকে অবলম্বন করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এক সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপিত হল। এর প্রায় একশ' বছর পরে নদীয়ায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্ণনাম প্রচার করে তিনি সারাভারতে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তুলসীদাসজী জন্মগ্রহণ করলেন। আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি রামচরিতমানস রচনা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের শতবর্ষ পরে তুলসীদাসজীর রামনাম প্রচার আরম্ভ হয় এবং অনতিকালের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল সেই ভক্তিরসে ভেসে যায়।

রামচরিতমানসের সীতা লক্ষ্মণ ভরত বিভীষণ শিব হনুমান এবং নারদ ভক্তিতত্ত্বের এক-একটি বিচিত্র নিদর্শন। এঁরা সবাই রামভক্ত কিন্তু কেউ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নন। অধিকারীভেদে তুলসীদাসজী তাঁদের ভক্তির বৈচিত্র্য এমন মধুরভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন যে রামচরিতমানস নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আজও অনন্য হয়ে রয়েছে।

রামচরিতমানসে তুলসীদাসজী মাঝে মাঝে তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বললেও তাঁব সমগ্র জীবনকথা আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। যতটুকু জানতে পারা গেছে, তাই সংক্ষেপে মনন ও স্মরণ করা যাক। আমি যে এখন সেই মহাকবির স্মৃতিমন্দির দর্শন করছি।

তুলসীদাসজীর জন্মতারিখ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। যে মতটি সব[illegible] বেশি মানুষ মেনে নিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা জেলার রাজাপুর গ্রামে যমুনার তীরে পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পবিবারে তাঁর জন্ম।

তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দুবে ও মাতার নাম হুলসী দেবী। ছোটবেলায় তুলসীদাসেব নাম ছিল রামবোলা। অভুক্ত মূলনক্ষত্রে জন্ম বলে পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাধ্য হয়ে মা শিশুটিকে মুনিয়া নামে এক দাসীকে দিয়ে দেন। মুনিয়া তাঁকে মানুষ করতে থাকলেন। কয়েক বছর পরে মুনিয়ার বিয়ে হল। তিনি রামবোলাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেন। রামবোলা সেখানে সুখে ছিলেন না। তাঁর জন্য মুনিয়াকেও মাঝে মাঝেই স্বামীর গঞ্জনা সইতে হত। তবু তিনি খেয়ে পবে কোনরকমে বড় হচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনদেবতার সে ইচ্ছে ছিল না। তাই একদিন হঠাৎ মুনিয়া মারা গেলেন। তুলসীর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছব। আত্মারামকে খবর দেওযা হল কিন্তু তিনি ছেলেকে ফিবিয়ে নিতে রাজী হলেন না। আর ইতিমধ্যে তাঁর অভাগিনী মাও মারা গিয়েছেন। মুনিয়ার স্বামী বালক তুলসীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

তুলসী পথে নেমে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করলেন। ভিক্ষে করতে কবতে তিনি রাজাপুর থেকে চিত্রকূটে পৌঁছলেন। আর সেই সঙ্গে তীর্থদেবতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন।

শূকরক্ষেতের মহাত্মা নরহরিদাস তীর্থদর্শন করতে চিত্রকূট গিয়েছিলেন। একদিন পথে বালক তুলসীদাসকে ভিক্ষে করতে দেখে তাঁর বড মায়া হল। [illegible] তাঁকে

আশ্রয় দিলেন এবং চিত্রকূট দর্শন শেষে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শূকরক্ষেতে ফিরে এলেন। অশিক্ষিত অনাথ বালকটি সাধুসঙ্গ লাভ করলেন। নরহরিদাসজীর মুখেই তুলসী একদিন রামায়ণ গান শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে ভক্তি ও কাব্যরসের সঞ্চার হয়ে গেল। আশ্রয়দাতা নরহরি তাঁর স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন।

কিছুদিন পরে নরহরিদাসজী তাঁকে নিয়ে কাশীতে গেলেন। মোক্ষক্ষেত্র বারাণসী দর্শন শেষে নরহরি সনাতন নামে একজন পণ্ডিতের কাছে তুলসীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে দেশে ফিরলেন। মেধাবী বালক তুলসীদাস পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত পণ্ডিতজীর কাছে বেদ বেদান্ত পুরাণ দর্শন ও ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করলেন। এবং সেই বয়সেই পাণ্ডিত্যে পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

জন্ম থেকে যে জন্মভূমি তাঁর সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, লেখাপড়া শেষ হবার পরে তাকেই কিন্তু তাঁর প্রথম মনে পড়ল, কাশী থেকে কিশোর তুলসী আবার রাজাপুরে ফিরে এলেন। তখন আর তাঁকে তাড়িয়ে দেবার মতো কেউ ছিল না সেখানে। পিতা গত হয়েছেন, তাঁর পরিবারেরও কেউ আর জীবিত ছিলেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত ত্যজ্যপুত্রই বাপের ভিটে পেয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের সাহায্যে সেখানে একটা ঘর বেঁধে তিনি বাস করতে থাকলেন।

তিনি রামায়ণ পাঠ করে পেট চালাতেন। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই কিশোর তুলসী রাজাপুরের প্রিয় কথকঠাকুব হয়ে গেলেন। যমুনার ওপারে তারপিতা গ্রামেব দীনবন্ধু পাঠক তাঁব রামকথা শুনে বড়ই খুশি হলেন। তিনি তাঁর মেয়ে* রত্নাবলীর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিলেন। তুলসী ও বত্নাবলী সুখে সংসার করতে থাকলেন।

কিছুদিন পরে দীনবন্ধুর ছেলে এসে একদিন রত্নাবলীকে তারপিতা নিয়ে গেলেন। স্ত্রী চলে যাবার পরে তুলসী বড় একা এবং অসহায় বোধ করতে থাকলেন। রত্নাবলীর রূপে ও গুণে তিনি এমনি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে ছেড়ে তিনি একটা দিনও থাকতে পারলেন না। বিরহকাতব তুলসী সেদিন রাতেই রত্নার কাছে যেতে চাইলেন।

কিন্তু কেমন করে যাবেন? তখন বর্ষাকাল। যমুনা উত্তাল। কেউ নৌকো নিয়ে সেই রাতে ওপারে যেতে রাজী হল না। অথচ তুলসীদাসকে যে যেতেই হবে। বাধ্য হয়ে তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

না, কোনো বিপদ হল না। তিনি নির্বিঘ্নে নদী পার হলেন। ভিজে জামা-কাপড়েই শ্বশুরবাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বলা বাহুল্য তাঁর অবস্থা দেখে কেউ হাসি চাপতে পারলেন না। সকলে তাঁকে উপহাস করতে থাকলেন। তুলসী নীরব রইলেন, কিন্তু রত্নাবলী বড়ই অপমানিত বোধ করলেন। তিনি তুলসীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—

'লাজ না লাগত আপকো, দৌরে আএহু নাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেম কো, কহা কহৌ মৈঁ নাথ॥
অস্থি চরমময় দেহ মম, তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মহঁ, হোতিন ন তৌ ভব্‌ভীতি॥'*

---

* মূল গোঁসাইচরিত

আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দৌড়ে চলে এলে, তোমার লজ্জা হল না। তোমার এই প্রেম যদি আমার অস্থিচর্মময় দেহের জন্য না হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের জন্য হত, তাহলে তোমার ভবভয় দূর হয়ে যেতো।

কথাটা তীরের মতো তুলসীর হৃদয়ে বিঁধল। তিনি শুধু একবার তাঁর প্রিয়তমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। কেউ তাঁকে বাধা দিলেন না। কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, তিনি আর কোনদিন ফিরে আসবেন না এবং স্বামীর জীবদ্দশাতেই রত্নাবলীকে বৈধব্যের জ্বালা সইতে হবে।

তুলসী আবার কাশীতে চলে গেলেন। শুরু হল তাঁর সাধনা ও বৈরাগ্যের জীবন। তারপরে তিনি তীর্থ পর্যটনে বের হলেন, সারা সমতল ভারত ভ্রমণ করলেন। তীর্থ দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে বহু সাধু-মহাত্মার সঙ্গে মত বিনিময় করে তিনি জীবন ও জগতের বহু রহস্য জানতে পারলেন। তবু তাঁর মন তৃপ্ত হল না। যাত্রা কবলেন কৈলাস-মানসের পথে।

মানস সরোবরের তীরে দাঁড়িয়েই তিনি বামচরিতমানস রচনার প্রেরণা লাভ করলেন। তারপরে চলে এলেন অযোধ্যায়। সেখানেই রামনবমীর পুণ্যতিথিতে তিনি তাঁররামচরিতমানস রচনা শুরু কবলেন। তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর। অনেকের মতে সেটি ১৬৩১ সংবত।

সম্ভবতঃ তিনি বালকাণ্ড অযোধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ড চিত্রকূটে এবং অরণ্যকাণ্ড থেকে পববর্তী অংশ কাশী ও অযোধ্যায় বসে রচনা করেছেন। তাঁর জীবনের শেষদিকে তিনি কাশীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস কবেছেন।

তুলসীদাস যখন কাশীতে বাস করতেন, তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। অর্থাৎ মুঘলযুগে কাশীর ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়েই টোডরমল নতুন বিশ্বনাথ মন্দির নির্মাণ করান.

কাশীতে বিভিন্ন স্থানে বাস করেছেন তুলসীদাসজী। কখনও পঞ্চগঙ্গা ঘাটে, কখনও হনুমান ফটক অথবা গোপাল মন্দিরে, কখনও বা অসি ও গঙ্গা সঙ্গমে। সেখানে তিনি রামমন্দির নির্মাণ করেন। শুধু তাই নয়, কাশীতে যে গুহাটিতে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন, আজও সেটি এবং সংলগ্ন তুলসীঘাট তাঁর অক্ষয় পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে।

যতদূর জানতে পাবা যায় ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে একানব্বুই বছর বয়সে রামধুন গান গাইতে গাইতে কাশীতে তিনি দেহবক্ষা করেন। তিনি রামচরিতমানস ছাড়াও বারোখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

॥ ছয় ॥

সত্যনারায়ণ তুলসীমানস মন্দির প্রায় কাশী মহানগরীর দক্ষিণসীমা। এর পরেই অসি নদী। তারপরে খানিকটা দক্ষিণে এগোলেই বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আজ আমরা অসিসঙ্গম কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয় দেখব না, আরেকদিন আসব। তাই তুলসীমানস থেকে আবার দুর্গাকুণ্ড রোড ধরে উত্তরে ফিরে চলেছি।

না, বেশিক্ষণ গাড়িতে বসে থাকতে হল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম দুর্গাবাড়ির সামনে। দুর্গাবাড়ি হল কাশীর প্রাচীনতম দুর্গামন্দির। মাঝারী আকারের মন্দির, কিন্তু বেশ ভাল ভাস্কর্যমণ্ডিত। বিশেষ করে নাটমন্দিরের গোলাকার পাথরের স্তম্ভগুলিতে দর্শনীয় খোদাইকাজ। মেঝেতে সাদা ও কালো মার্বেল টাইল্‌স। এক কথায় উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যকলায় নির্মিত ভারী ছিমছাম মন্দির।



প্রাতঃস্মরণীয়া নাটোরের মহারাণী ভবানী এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। মন্দিরের মোহনটি তৈরি করে দিয়েছেন তখনকার সুবেদার। নাটমন্দিরে কয়েকটি বড় বড় ঘণ্টা ঝুলছে। এর একটি দিয়েছেন নেপালের মহারাজা আরেকটি জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ। সেটির বয়স নাকি শতাধিক বছর।

মন্দিরটি খুব বড় না হলেও অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দিরএলাকা। মন্দিরের পাশে বড়-বড় গাছে ছাওয়া বাগান আর মন্দিরের পেছনে সুবিশাল দীঘি—দুর্গাকুণ্ড। আগে নাকি আরও অনেক বড়-বড় গাছ ছিল, বিশেষ করে তেঁতুল গাছ। বানরের অত্যাচার কমাবার জন্য সেগুলো সব কেটে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু বালি-সুগ্রীবের বংশধরদের অত্যাচার কমেছে কি? বোধকরি না। কারণ

কয়েক বছর আগে যে সংখ্যা দেখে গিয়েছি, আজ তার চেয়ে মোটেই কম মনে হচ্ছে না। তবে বানরের এই উৎপাত সত্ত্বেও শীতকালে ছুটির দিনে এখানে শত শত মানুষ বনভোজন করতে আসেন। অবশ্য বলা বাহুল্য বানরদের সেই ভোজনে একটা অংশ থাকে। বানরদের এই আধিক্যের জন্য বিদেশী পর্যটকরা দুর্গাবাড়ির নাম দিয়েছেন—Monkcy Temple, এবং নামটি এখনও বেশ প্রচলিত।

কেবল বনভোজনে নয়, পূজা-পার্বণেও বানরদের একটা অংশ আছে। তাই মন্দিরের সামনে ফুল ও মিষ্টির দোকানের পাশে পাশে ছোলাভাজার দোকান বসেছে। পুজোর ডালির সঙ্গে নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ পয়সার ছোলাভাজা কিনতেই হচ্ছে পূজার্থীদের। নইলে যে তাঁরা মায়ের ডালি নিয়ে পৌঁছতে পারবেন না মায়ের সামনে। অর্থাৎ বালী-সুগ্রীব কিম্বা মহাবীবের সুযোগ্য বংশধরগণ আপনার ডালি ছিনতাই করবে।

সেই কথাই বলি টুকু অপু ও অর্চনাকে। ওরাও ফুল ও মিষ্টির সঙ্গে ছোলাভাজা কিনে ফেলে। এবং তা তিন ঠোঙ্গা নয়, চার ঠোঙ্গা। চার ছেলে মেয়ের জন্য। ওরা চারজন ঠোঙ্গা হাতে তিন মা-কে 'এসকর্ট' করে নিয়ে চলেছে।

বানবের অত্যাচাব সত্ত্বেও দুর্গাবাড়ি কাশীর জনপ্রিয়তম মন্দিরসমূহের অন্যতম। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার পবেই এই মন্দিব। সারা বছর সারাদিন ধরে এখানে পুণ্যার্থীদের আসা-যাওয়া। তবে মঙ্গল ও শনিবারে কিছু বেশি ভিড় হয়। আগেই বলেছি, এটি কাশীর একটি প্রাচীনতম মন্দিব। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা ধর্মান্ধ আক্রমণকারীরা এখানে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেন নি। ফলে পুরনো মন্দিরের জায়গাতেই রাণী ভবানী এই নতুন মন্দিব নির্মাণ কবতে পেবেছেন।

দেবী দুর্গা মোক্ষক্ষেত্র বারাণসী ধামের দক্ষিণ দিকে রক্ষাকর্ত্রী। শ্রাবণ মাসে এ মন্দিব-কাননে আর দুর্গাকুণ্ডেব তীবে তীরে মেলা বসে। সেটি কাশীর বৃহত্তম মেলাগুলির অন্যতম।

নাটমন্দির পার হয়ে গর্ভমন্দিবের সামনে এসে দাঁড়াই। দেবী দশভুজাকে প্রণাম কবি, মহালক্ষ্মী কাত্যায়নীকে প্রণাম করি, ভুবনমনমোহিনী কমনীয়া কান্তিধারিণী মা-ভগবতীকে প্রণাম কবি।

তারপরে তিন ছেলেকে নিযে বেরিয়ে আসি বাইরে। ওরা পুজো দিচ্ছে, এই অবসরে ছেলেদের একটু বাগান ও কুণ্ডটি দেখিয়ে আনা যাক্। ধীরেনের মেয়েটা কিন্তু আমাদের সঙ্গী হয় না। বয়সে ছোট হলেও মায়ের জাত। এসেছে মায়ের মন্দিরে। তাই মায়ের সঙ্গে মাতৃপূজা দর্শন করছে।

পুজোয় মনযোগ না থাকলেও প্রসাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছেলেদের। সুতরাং পূজারিণীদের মন্দির থেকে বেরুতে দেখেই তারাকুণ্ডের তীর থেকে ছুট লাগায় সেদিকে। ছুটে এসে মায়েদের সামনে হাত বাড়ায়। মায়েরা আঁচলে বাঁধা প্রসাদের পুঁটুলি খুলতে উদ্যত হয়।

পাণ্ডাজী হা হা করে ওঠেন। বলেন—করছেন কি? এখানে প্রসাদ বের করলেই চারিদিক থেকে বানরের দল ঘেরাও করবে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে বসুন!

আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নির্দেশ পালন করি। গাড়ি এগিয়ে চলে। টুকু প্রসাদ দেয়। অপু বলে ওঠে—এতটুকু!

—ও কথা বলে না বাবা! প্রসাদ কণিকামাত্র।

সত্যি সত্যি অপু আর প্রসাদের প্রসঙ্গ তোলে না। তবে জিজ্ঞেস করে—এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—তিল-ভাণ্ডেশ্বর। ড্রাইভার উত্তর দেয়।

—কতক্ষণ লাগবে?

—বলা মুশকিল। কারণ সেটা রাস্তার ভিড়ের ওপর নির্ভর করে। তবে দূর বেশি নয়, পাঁড়ে হাউলী বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলের কাছে। পথে আমরা মেনকা মন্দির, গুরুধাম ও কেনারামের স্থান দেখব।

—তার মানে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে তিল-ভাণ্ডেশ্বর পৌঁছতে!

ড্রাইভার মাথা নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে অপু বলে ওঠে—তাহলে কিছু বলো না গো!

—কি?

—কাশীর কথা।

হায় হরি! এই কথা বলার জন্য এত কথা। একটু হেসে বলতে শুরু করি—ভক্ত হিন্দুদের কাশী এসে অন্তত তিনটি মন্দির দর্শন করতেই হয়। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ও দুর্গা।

—তাহলে তো আমাদের কাশী দর্শন শেষ হয়ে গেল! সুধাংশু সানন্দে বলে ওঠে।

কথাটা একদিক থেকে মিথ্যে না হলেও, আসল সত্য হল মাসাধিককাল ধরে সকাল দুপুর সন্ধ্যে ছুটোছুটি করেও কাশী দর্শন শেষ করা যাবে না। কারণ কাশীতে অসংখ্য দর্শন।

দুর্গাবাড়ি থেকে বাবলা আমাদের গাড়িতে এসেছে। কিন্তু এতক্ষণ সে একটাও কথা বলে নি। এবারে আমি থামতেই হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা জেঠু, মন্দিরের সামনে ইংরেজী 'Y' অক্ষরের মতো একটা কাঠ পোঁতা রয়েছে দেখেছো?

—হ্যাঁ।

—ওটা কি?

—হাড়িকাঠ।

—ওখানে অত রক্ত কেন?

কি উত্তর দেব? কেবল মনে পড়ছে ১৮৮৭ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ভূমিকাটি—'একটা পাথরের মন্দির'। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণস্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন? বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়,...'

শতাধিক বছর আগে সেই স্বপ্নের মেয়েটি যে প্রশ্ন করেছিল, আজ বাস্তবের ছেলেটিও সেই একই প্রশ্ন করছে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' লিখে। বলেছেন—'জীবজননীর পূজা জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে।'

কিন্তু কবির কথা কে শুনল? রঘুপতিরা জীবজননীর নামে আজও জীবরক্ত নিয়ে চলেছেন। আর তাই দেখে একশ' বছর পরে এই কম্পিউটার যুগের ছেলেটাও

বেদনাবোধ করছে, ভয় পেয়েছে, করুণস্বরে সেই একই প্রশ্ন করছে—এত রক্ত কেন?

বাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবু আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। কেবল আমি নই, সুধাংশু আর মনোরঞ্জনও নীরব। বুঝতে পারছি, তাদেরও এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।....

শেষ পর্যন্ত দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাই এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দেন আমাদের। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলে ওঠেন—মেনকা মন্দির।

—নামতে হবে কি? টুকু জিজ্ঞেস করে।

একটু হেসে বলি—তোমাদের ইচ্ছে। তবে অনেকে বলেন, দুর্গাদর্শন করে ফেরার পথে মা-মেনকাকে মেয়ের কুশল সংবাদ দিয়ে যেতে হয়।

—তার জন্য গাড়ি থেকে নামার দরকার কি? টুকু কিছু বলতে পারার আগেই সুধাংশু বলে ওঠে—মা-মেনকা অন্তর্যামী। গাড়িতে বসে তাঁর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম জানিয়ে তাঁকে মেয়ের কুশল সংবাদ দিয়ে যাওয়া যাক্।

—মানে তুমি নামতে নিষেধ করছ? টুকু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে।

সুধাংশু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে তাড়াতাড়ি সন্ধি করে—না, না, নিষেধ করব কেন? তোমাদের ইচ্ছে হলে নামতে পারো বৈকি!

—কিন্তু তোমার ইচ্ছে নেমে আর সময় নষ্ট না করা?

বেচারী সুধাংশু কি বলবে বুঝতে পারছে না। পরিহাসের এমন পরিণতি প্রত্যাশা করে নি সে।

কপট গাম্ভীর্য পরিহার করে টুকু একটু হাসে। তারপরে দু-হাত জোড় করে চোখ বুজে মা-মেনকার উদ্দেশে তার প্রণাম নিবেদন করে। আমরাও তাই করি।

ড্রাইভার পেছন ফিরে তাকান। টুকু বলে—চলুন, যাওয়া যাক্।

গাড়ি চলতে শুরু করে। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র। তারপরেই আবার গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলেন—ঐ যে উঁচু মন্দিরটা দেখছেন, ওটাই গুরুধাম। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তৈরি করিয়েছেন। মন্দিরটি সাধারণ কিন্তু গুরুমূর্তিটি অসাধারণ সুন্দব। বাগানটিও ভারী চমৎকার।

গাড়ি আবার এগিয়ে চলে। এবারেও একটু বাদে থেমে যায়। ইঞ্জিন বন্ধ করে ড্রাইভার বলেন—এ জায়গাটার নাম কিরিমকুণ্ড। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অঘোরী সিদ্ধ মহাপুরুষ কেনারাম বাস করতেন এখানে। জায়গাটির পরিবেশ এখনও নিভৃত রয়েছে। অঘোরী সম্প্রদায়ের সাধকগণ বাস করেন এখানে।

—এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

পায়লট উত্তর দেন—তিল-ভাণ্ডেশ্বর।

—সে তো সেই পাঁড়ে হাউলীতে।

—জী হাঁ। বঙ্গালীটোলা হাইস্কুলের উত্তর-পশ্চিমে।

—সেখানে পৌঁছতে তো বেশ সময় লাগবে।

পায়লট মাথা নাড়েন। বলেন—রাস্তার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন, এত ভিড়ে গাড়ি চালানো....বুঝতেই পারছেন।

—তাহলে শঙ্কুদা, আবার কাশীর কথা....

টুকুকে শেষ করতে দেয় না বাবলা। সে বলে ওঠে—তাই ভাল।

বলা বাহুল্য দুর্গাবাড়িতে ট্যাক্সি বদল করবার পর থেকেই সে এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অতএব আপত্তি না করে আমি বলি—গতকাল দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে তোমরা মালব্য পুল দেখেছো?

অপু ও বাবলা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—এপারে যেখান থেকে মালব্য পুল শুরু হয়েছে, সে জায়গাটার নাম রাজঘাট। জায়গাটি বেশ উঁচু, অনেকখানি সমতল অঞ্চল জুড়ে, অনেকটা মালভূমির মতো। এখানেই প্রথম জনপদ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ রাজঘাট প্রাচীন বারাণসীর প্রাচীনতম অংশ। সেকালে পূর্ব ভারত থেকে উত্তর ভারতে যেতে হলে মালব্য পুলের জায়গা দিয়েই গঙ্গা পার হতে হত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ গয়া থেকে সারনাথ আসার সময়ে নিশ্চয় ওখানেই গঙ্গা পার হয়েছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেব যে পথে কাশী এসেছিলেন, আমরাও সেই পথে কাশী এসেছি।

তোমরা জানো, খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের ভারতকথা যেমন রয়েছে রামায়ণ মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে, তেমনি রয়েছে জাতকের গল্পে।

—কি আছে? অপু জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—জাতকের গল্প থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালে বারাণসী ছিল কাশী রাজ্যের রাজধানী। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত সেই সুরক্ষিত জনপদটি ছিল দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত মহানগরী। আর কাশী ছিল অতিশয় শক্তিশালী ও সুসভ্য রাজ্য। তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরে বুদ্ধদেব বারণসীর উপকণ্ঠ সারনাথকেই তাঁর প্রথম প্রচারভূমিরূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সারনাথকে অবলম্বন করে এক বৌদ্ধনগরী গড়ে ওঠে। এখনও সারনাথ ও সারনাথের পথে সেকালের সেই বৌদ্ধবসতির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তাই বলে কিন্তু হিন্দু-বারাণসী বিলীন হয়ে যায় নি। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস খ্রীষ্টপূর্ব ৩০২ সালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, উত্তরদিকে সারনাথ পর্যন্ত ছিল বৌদ্ধনগরী আর গঙ্গার তীরভূমি জুড়ে ছিল হিন্দু-বারাণসী।...

সারনাথের কথা এখন থাক, বারাণসীর কথাতেই ফিরে আসছি। সেকাল ও তার পরবর্তীকালের ঐশ্বর্যময়ী বারাণসী মহানগরী আজ আমাদের কল্পলোকের জনপদ। কারণ আগেই বলেছি যে মুহম্মদ ঘুরীব ধর্মান্ধ সেনাপতি কুতুব-উদ্-দিন আইবেক দ্বাদশ শতকে সারনাথসহ বারাণসীর ওপর যে নিষ্ঠুর আঘাত করেন, তাতে রাজঘাট অঞ্চল জনহীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে নিম্ন-উপত্যকায় জনবসতি শুরু হয়। বলা বাহুল্য সেই নতুন নগরীর ওপরেও ধর্মান্ধ শাসকদের আঘাত এসেছে তারপরে প্রায় প্রা৻ত শতাব্দীতে, সপ্তদশ শতক পর্যন্ত। কিন্তু কাশী আছে, সে থাকবে চিরকাল।

—আচ্ছা, রাজঘাটে কোন পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য হয় নি? মনোরঞ্জন প্রশ্ন করে।

—হয়েছে বৈকি! তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

—যেমন?

—নিতান্তই আকস্মিক ভাবে সেই খননকার্য আরম্ভ করতে হয়েছিল ১৯৪০ সালে। কাশী রেলস্টেশন তৈরি করার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল, তখন নবম শতকের নগর প্রাচীরের একাংশ আবিষ্কৃত হয়। তারপরে আবার ষাটের দশকে কিছু খননকার্য

করা হয়েছে। বোঝা গিয়েছে যে রাজঘাটের তৃণাচ্ছাদিত উঁচু সমতলের নিচেই সেকালের বারাণসী নগরীর হৃদ্‌পিণ্ড লুকিয়ে রয়েছে। তবু অনিবার্য কারণে খননকার্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে।....

—তিল-ভাণ্ডেশ্বর।

পায়লটের কথা শুনে আমাকে কথা থামাতে হয়। তাকিয়ে দেখি পাঁড়ে হাউলীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলের সামনে গাড়ি থেমেছে। কিন্তু আমরা নামতে পারি না। তার আগেই পেছনের ট্যাক্সি এসে যায়। দুই পায়লট আলোচনার পরে স্থির করে, আরও খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে একেবারে তিল-ভাণ্ডেশ্বরের সামনে যাওয়া যাবে, সেখানে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা রয়েছে।

অতএব গাড়ির ইঞ্জিন আবার গর্জে ওঠে, আমরা এগিয়ে চলি।

একটু বাদেই তিল-ভাণ্ডেশ্বর মন্দিরের সামনে পৌঁছে যাই। এ মহল্লাটার নামও তিল-ভাণ্ডেশ্বর।

গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরে আসি। মাঝারী আকারের মন্দির কিন্তু বিগ্রহটি বেশ বড়। দেখে বেশ পুরনো বলেও মনে হচ্ছে। কাশীখণ্ডে এর উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে, প্রতিদিন নাকি এই বিগ্রহ এক তিল করে বড় হচ্ছেন, তাই এঁর নাম তিল-ভাণ্ডেশ্বর।

মেয়েরা পুজো দেয়। পুজোর পরে পূজারী প্রসাদী ফুল ও মিষ্টি দিয়ে বলেন—এবারে ঐ তিন ছেলে ও মেয়েটিকে এখানে আসতে বলুন। ওরা একবাব আমার কাছে আসুক।

মায়েদের ডাকে অপু, বাবু, বাবলা ও বাবলি এগিয়ে আসে সামনে, গর্ভমন্দিরের দ্বারে।

পূজারী বিগ্রহের পায়ের কাছ থেকে বেছে বেছে টাটকা ফুল ও বেলপাতা এনে তাদের হাতে দিয়ে বলেন—এই আশীর্বাদ যত্ন করে বাড়ি নিয়ে যাবে। তারপরে প্রত্যেক পাঠ্য বইয়ের ভেতবে একটি বেলপাতা কিম্বা ফুলের কয়েকটি পাপড়ি দিয়ে রাখবে।

—রাখব। কিন্তু কেন বলুন তো?

অপু এ যুগের ছেলে। যুক্তি ছাড়া কোন কিছুকেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

পূজারী বলেন—তিল-ভাণ্ডেশ্বর হলেন ছাত্র-ছাত্রীদের পরম কল্যাণময় দেবতা। তিনি তোমাদের পরীক্ষার বৈতরণী পার করে দেবেন। তাই কাশীর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার আগে এসে ধর্মনির্বিশেষে তাঁর পুজো দিয়ে যায়।

অপু আগামী বছর দশম শ্রেণীতে উঠবে। পরের বছরই তার মাধ্যমিক পরীক্ষা। অতএব তার পক্ষে আর কোন যুক্তির অবতারণা করা সম্ভব হয় না। সে ভক্তিভরে আশীর্বাদী ফুল ও পাতা কপালে ছোঁওয়ায়। তারপরে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে তিল-ভাণ্ডেশ্বরজীকে। বাবু, বাবলা ও বাবলি তাকে অনুসরণ করে।

॥ সাত ॥

তিল-ভাণ্ডেশ্বর থেকে ফিরে এসেছি হোটেল যমুনায়। আজকের মতো দর্শন হয়েছে শেষ। কিন্তু দর্শনার্থীদের দিন ফুরোয় নি। তাদের দিন ফুরোয় মাঝরাতে। অতক্ষণ তো আর শুধুই দেবদর্শন নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায় না, তাই আড্ডা আর কেনাকাটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে হয়। এবং এ দুটিও নিঃসন্দেহে দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ।

হোটেলে আমরা তাই কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে আর কিছুক্ষণ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আড্ডা দিয়েছি। তারপরে সন্ধ্যা সমাগমে ওরা আবার তৈরি হয়েছে। ওরা মানে টুকু-সুধাংশু, অর্চনা-মনোরঞ্জন এবং মঞ্জু ও ধীরেন। ওরা তৈরি হয়ে বিশ্বনাথ গলির দিকে গিয়েছে। উদ্দেশ্য কিছু কেনাকাটা করা।

দর্শনের সহযাত্রী হলেও আমরা ওদের এসব ব্যাপারে নেই। আমরা মানে অপু, বাবু, বাবলা, বাবলি এবং আমি। আমার খুদে সহযাত্রীদের সঙ্গে আমি তাই হোটেলের ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি। অর্থাৎ ওদের কাছে গল্প বলছি।

ডিটেকটিভ কিম্বা ভূতের গল্প নয়, কাশীর গল্প—কাশীখণ্ডের কথা। কথায় কথায় অপু জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা জেঠু, পুরাণের মতে কাশীর সৃষ্টি হল কিভাবে?

উত্তর দিই—আমাদের এই পৃথিবী অর্থাৎ মর্ত্যলোক যখন প্রলয় পয়োধিজলে ডুবে গিয়েছিল, তখন পৃথিবীতে কোন প্রাণ অর্থাৎ জীব-জন্তু গাছপালা কিছুই ছিল না। ছিলেন কেবল পরমপুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। তিনি ক্ষীরসাগরে শুয়েছিলেন।

শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় তাঁর ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছে হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিবরূপ ধারণ করলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর মনে হতে থাকল, তিনি বড় একা। একজন সঙ্গী হলে ভাল হয়। তখন তিনি তাঁর শরীরের বাঁদিকের অঙ্গ বা অংশ দিয়ে অন্নপূর্ণাকে সৃষ্টি করলেন। এই দেবী অন্নপূর্ণা হলেন পরমেশ্বরের প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি আর আমাদের জগন্মাতা। তিনিই ভগবতী জগদ্ধাত্রী অথবা দেবী দুর্গা।

শিব ঠিক করলেন শিবানীর সঙ্গে তিনি মর্ত্যলোকেই বসবাস করবেন। কিন্তু তাহলে তো তাঁকে জগতের যাবতীয় জীবদের সৃষ্টি করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে এমন একটি স্থান রচনা করতে হয়, যেখানে যেকোন প্রাণী প্রাণত্যাগ করলে মহানির্বাণ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে পারে, তাকে আর জন্ম না নিতে হয়। এই ভেবে সেই পরমপুরুষ পঞ্চক্রোশী কাশীধাম মানে ষোল কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই কাশী শহর সৃষ্টি করলেন।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর তখন ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করে বিষ্ণুরূপে তাঁকে রক্ষা করতে থাকলেন। তিনি বেদ সৃষ্টি করলেন এবং কাশীবাসীরা যাতে বেদবিরোধী কাজ না করেন, সেদিকে নজর রাখলেন। শিবরূপী মহেশ্বর তখন মহামায়াকে নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন।

—হয়ে গেল! আমি থামতেই বাবলি বলে ওঠে। বারো বছরের বাবলি আমাদের দলের একমাত্র 'লেডি-মেম্বার'।

—আরেকটা গল্প বলো জেঠু! বাবু যোগ করে।

—তাই ভাল। কনিষ্ঠ বাবলা ঠিক হয়ে বসে।

আর অপু বলে—আমাদের দাবী মানতেই হবে।

অতএব আবার আরম্ভ করতে হয়—তোমরা কাশীর মণিকর্ণিকা কুণ্ডের নাম শুনেছো?

—হ্যাঁ। ওরা মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি—মহেশ্বর মহামায়াকে নিয়ে কৈলাসে চলে যাবার পরে বিষ্ণু চক্র দিয়ে একটি পুকুর কাটলেন। নিজের স্বেদ অর্থাৎ ঘাম দিয়ে সেই পুকুর ভরে নিয়ে....

—বিষ্ণুর এত ঘাম হল জেঠু! অবিশ্বাসী স্বরে বাবলা বলে ওঠে।

কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই অপু উত্তর দেয়—এসব পুরাণের গল্প, দেবতাদের ব্যাপার। তাঁদের অসাধ্য কিছু নেই।

—তুমি গল্পটা বলো জেঠু! বাবু তাগিদ লাগায়।

আমি শুরু করি—কাশীর কল্যাণ কামনায় বিষ্ণু সেই কুণ্ডের তীরে তপস্যায় বসলেন। দিন গেল, মাস কাটল, বছর পেরিয়ে গেল। দুই-এক বছর নয়, পাঁচ হাজার বছর।

অবশেষে বিষ্ণুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আশুতোষ সেখানে এলেন। তবু তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল না। বিষ্ণুর একাগ্রতা দেখে শিব বিস্মিত হলেন। তাঁর শরীর কেঁপে উঠল। সেই কাঁপুনিতে তাঁর কান থেকে মণিময় কর্ণিকা বা কানের দুল খসে পড়ল। সেই থেকে জায়গাটিব নাম হল মণিকর্ণিকা। আবার চক্র দিয়ে বিষ্ণু সেই সরোবর খনন করেছিলেন বলে জায়গাটাকে চক্রতীর্থও বলে।

ধ্যানভঙ্গ হবার পরে মহাবিষ্ণু মহাদেবকে দর্শন করে খুশি হলেন। বললেন—আপনি বরদান করুন, এই পঞ্চক্রোশী কাশীধামে মানুষ পশু কীট পতঙ্গ যে কেউ প্রাণত্যাগ করলেই যেন নির্বাণ মুক্তি লাভ কবে। তাকে যেন আবাব জন্ম নিতে না হয়।

আপন ইচ্ছার কথা বিষ্ণুর মুখে শুনে দেবাদিদেব ভারী খুশি হলেন। সহাস্যে শঙ্কর বলে উঠলেন—তথাস্তু!

—কিন্তু বিষ্ণু জলের জন্য গঙ্গাতীবে আবার একটি কুণ্ড খনন করলেন কেন? এবারে বাবু জিজ্ঞেস কবে।

আমি উত্তর দিই—কাশীখণ্ডের মতে আগে মণিকর্ণিকা, তারপরে গঙ্গা। ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন অনেক পরে। গঙ্গাসাগরে অর্থাৎ কপিলসদনে যাবার সময় গঙ্গা মণিকর্ণিকাকে গঙ্গোদক দান করেছেন। ত্রিভুবনতারিণী ভগবতী গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে মণিকর্ণিকা মহাতীর্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

সংসারে সর্বত্র শুধু চরৈবেতি। থামলেই চাবিদিকে চিৎকার উঠবে, একি থামলে কেন? এগিয়ে চলো, আগে আরও আগে। মিনিবাসের কণ্ডাক্টর থেকে আমার এই খুদে সহযাত্রীরা সবাই এই চরৈবেতির সামিল হয়েছে। সুতরাং আমি থামতেই ওরা বলে ওঠে—একি জেঠু! থামলে কেন? বলো, আরেকটা গল্প বলো!

অতএব আমাকে কালভৈববের উপাখ্যান শুরু করতে হয়—একদিন ব্রহ্মা ও নাবায়ণ সুমেরু পর্বতশিখরে এলেন। সেখানে তখন দেবতাদেব নামযজ্ঞ হচ্ছে। বহু ঋষি ও দেব-দেবী উপস্থিত হয়েছেন। ব্রহ্মা ও নাবায়ণ তাঁদেব পাশে বসে পড়লেন। যজ্ঞ দেখতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ বাদে কথায় কথায় জনৈক ঋষি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস কবলেন—ঠাকুর্দা, আচ্ছা অব্যয়-ব্রহ্ম কে?

—কে আবাব, আমি! কাবণ আমি জগতেব সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা গম্ভীব স্ববে উত্তব দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ কবলেন নাবায়ণ। বললেন—আমি অব্যয়-ব্রহ্ম, কাবণ আমি জগৎকে পালন কবছি।

ব্রহ্মা উঠে দাঁড়ালেন, নারায়ণও বসে বইলেন না। দুজনেব মধ্যে বীতিমত ঝগড়া বেধে গেল। ব্রহ্মা ও নারায়ণেব কলহ! সুতবাং ব্যাপাবটা মোটেই সহজ নয়। যেকোন সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পাবে। তাই ঝগড়া মেটাতে চাব-বেদ ঋষিদেব রূপ নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদেব সামনে পেয়েই ব্রহ্মা জিজ্ঞেস কবলেন—তোমবাই বলো, অব্যয়-ব্রহ্ম কে? আমি অথবা নাবায়ণ?

—আজ্ঞে আপনাদেব দুজনেব কেউই নন। বেদগণ সবিনয়ে উত্তব দিলেন।

—কে তাহলে? ব্রহ্মা বাগে কাঁপতে শুরু কবলেন।

বেদগণ উত্তব কবলেন—দেবাদিদেব মহাদেবই অব্যয় ব্রহ্ম।

—মিথ্যে কথা। নাবায়ণ প্রতিবাদ কবলেন—আমিই অব্যয-ব্রহ্ম।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুব এই অশুভ বিবাদ বন্ধ কবাব জন্য ঠিক তখুনি পাতাল থেকে একটা জ্যোতি বা আলোব শিখা সেখানে উঠে এলো। সেই জ্যোতিব মাঝে সবাই সবিস্ময়ে স্বযং শূলপাণি রুদ্র অর্থাৎ শিবকে দেখতে পেলেন।

ব্রহ্মা ভাবলেন নিজেকে অব্যয়-ব্রহ্ম প্রমাণ কবাব এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—এই যে বৎস রুদ্র! আমি তোমাব পিতা। আমাকে প্রণাম কবো।

ব্রহ্মাব কথা শুনে রুদ্র বেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁব ললাটদেশ বা কপাল থেকে এক ভয়ঙ্কব পুরুষ সৃষ্টি কবলেন। এই বীবপুরুষেব নামই কালভৈবব।

রুদ্রেব আদেশে কালভৈবব তাঁব নখ দিযে ব্রহ্মাব চাব মাথাব ওপবে যে আবেকটা মাথা ছিল, সেটা কেটে দিলেন। কিন্তু তাবপবেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মাথাটা কালভৈরবেব হাতেব সঙ্গে লেগে বইল।

কেবল ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণুও ব্যাপাব-স্যাপাব দেখে ভয় পেযে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রুদ্রবন্দনা কবে সেখান থেকে সবে পড়লেন।

বিপদে পড়লেন কালভৈবব। বহু চেষ্টা কবেও তিনি ব্রহ্মাব বাড়তি মাথাটা হাত থেকে খসিয়ে ফেলতে পাবলেন না। নিরুপায কালভৈবব বাধ্য হয়ে রুদ্রেব কাছে এলেন। রুদ্র বললেন—এই মাথাটা নিয়েই তুমি সব তীর্থ পবিক্রমা কবো, কোন তীর্থে অবশ্যই মস্তকমুক্ত হবে।

শুরু হল কালভৈববেব তীর্থপবিক্রমা। কিন্তু পুব-পশ্চিম উত্তব-দক্ষিণেব কোন

তীর্থেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হল না। ব্রহ্ম হত্যার পাপে তাঁকে শেষ পর্যন্ত নরকবাস করতে হবে বুঝতে পেরে বড়ই মনমরা হয়ে পড়লেন।

নিশ্চিত নরকবাসের কথা ভাবতে ভাবতে অবশেষে তিনি এই কাশীধামে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার মাথাটি তাঁব হাত থেকে খসে পড়ল। তিনি মুক্তির আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

আর তখুনি রুদ্র তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—তোমাকে এখন থেকে এই আনন্দকানন কাশীধামেই বাস করতে হবে। তুমি হবে কাশীর প্রহরী। তোমার পূজা না করে আমার পূজা করলে সে পূজা বিফল হবে।

—জেঠু!

আমি থামতেই অপু ডাক দেয়। জিজ্ঞেস করি—কি বলছ?

—সবে সাড়ে আটটা বেজেছে। মার্কেটিং সেরে মা-কাকীরা সাড়ে ন'টার আগে ফিরে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

ঠিকই বলেছে ছেলেটা। বিশ্বনাথ গলিতে ঢুকে আলো-ঝলমল দোকানের সারি দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারার মতো মেয়ে আজও আমার চোখে পড়ে নি। আব এ কথাটা কেবল বাঙ্গালী মেয়েদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, জগতের যাবতীয় নাবীকুলের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। কারণ আগেই বলেছি, বিশ্বনাথ গলিতে ঢুকে আমার ফরাসী বোন গ্রাব্রিয়েল রিফস্থালেবও একই হাল হয়েছে।

অতএব অপু ঠিকই বলেছে। কিন্তু আসল কথাটি সে এতক্ষণে প্রকাশ করে—তাই বলছিলাম, খেতে যখন দেরি আছে, তখন কাশীর ওপরে আর দুয়েকখানি গল্প বলুন না?

—ঠিক বলেছো অপুদা! বাবলি ও বাবলা বলে ওঠে। বাবু মাথা নাড়ে।

আর আমি বিনা প্রতিবাদে আরম্ভ কবি—এবারে আমি তোমাদের দণ্ডপাণির কথা বলব।

—বেশ বলুন। ওরা ঠিক হয়ে বসে।

আমি শুরু করি—পূর্ণভদ্র নামে একজন যক্ষরাজা ছিলেন। অনেক যাগ-যজ্ঞ করার পরেও যখন তাঁব ঘরে ছেলে এলো না, তখন তিনি শিবের আরাধনা আরম্ভ করলেন। বছর খানেকেব মধ্যে তিনি একটি পুত্রলাভ করলেন। খুবই গুণী ছেলে। পূর্ণভদ্র তাঁর নাম রাখলেন হবিকেশ।

শিশুকাল থেকেই হরিকেশ অতিশয় শিবভক্ত হয়ে উঠলেন। শিবের কৃপায় সন্তানলাভ করলেও পূর্ণভদ্র পুত্রের এই আচরণ মেনে নিতে পারলেন না। একদিন তিনি ছেলেকে বললেন—বাবা হরিকেশ! তুমি এখনো শিশু, এটা তোমার শিবপূজার সময় নয়। এখন তোমার লেখাপড়া করার বয়স, তাই করো। বড় হয়ে শিবপূজা ক'রো।

শিশু সহাস্যে উত্তর দেয়—শিবপূজার তো কোন বয়স নেই বাবা! যে কোন মানুষ যে কোন বয়সে শিবপূজা করতে পাবে। তাছাড়া মানুষের জীবনেরও তো নির্দিষ্ট সময় নেই। এই যে আমি, আমি তো আগামীকালও মরে যেতে পারি। তাই দয়া কবে আপনি আমায় শিবপূজায় বাধা দেবেন না।

ছোটছেলের মুখে বড়কথা শুনে যক্ষরাজ রেগে গেলেন? তিনি 'দূরীভব' বা দূর হয়ে যা, বলে ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

হরিকেশ তখন সবে আট বছরে পা দিয়েছে। বুঝতে পারলেন না কোথায় যাবেন, কি খাবেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে পথ চলতে থাকলেন। চলতে চলতে কাশী এলেন। তারপরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শিবের আরাধনা শুরু করে দিলেন। খাওয়া নেই স্নান নেই ঘুম নেই, শুধু শিবপূজা—তপস্যা। দিন গেল মাস গেল বছর পেরিয়ে গেল, বছরের পর বছর। সারা শরীরে শাঁখের গুঁড়োর মতো মাটির স্তূপ জমে উঠল। তবু তাঁর তপস্যা ভাঙ্গল না।

সর্বজ্ঞ শিব দূর থেকে সবই দেখছিলেন। ভক্তবৎসল শিব আর দূরে থাকতে পারলেন না। কাছে এলেন, মাটির স্তূপ সরিয়ে হরিকেশের ধ্যান ভাঙ্গালেন। জিজ্ঞেস করলেন—বৎস হরিকেশ, বলো কি তোমার প্রার্থনা?

বিশ্বনাথের অপরূপ রূপ দর্শন করে হরিকেশ তাঁর কথা হারিয়ে ফেললেন। তিনি অপলক নয়নে কিছুক্ষণ তাঁর ইষ্টদেবতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে গঙ্গাধরের পায়ের ওপরে মাথা রেখে কাঁদতে থাকলেন। করুণানিধান বিশ্বেশ্বর হরিকেশকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন। তারপরে একটি দণ্ড মানে লাঠি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—আজ থেকে তোমার নাম হল দণ্ডপাণি বা দণ্ডধারী। তোমার ওপরে আমি এই কাশীধামের কর্তৃত্ব প্রদান করলাম। এখানে যাঁর মৃত্যু হবে, তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি তাকে নির্বাণমুক্তি দান করব। এ ছাড়া তুমি দাম্ভিক ও পাপীদের কাশীধাম থেকে দূর করে দেবে আর দূর দেশের পুণ্যবানদের কাশীতে নিয়ে এসে রক্ষা করবে। এখন থেকে তুমি সর্বদা আমার সামনে থাকবে। যে তোমার পূজা করবে, আমি কেবল তার পূজাই গ্রহণ করব। আর তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গের নাম হল দণ্ডপাণিশ্বর।

—হয়ে গেল!

আমি থামতেই বাবু বলে ওঠে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই অপু জবাব দেয়—হবে না তো এর পরেও কিছু থাকবে নাকি? এতদিন ধরে গল্প শুনছিস আর গল্প কোথায় শেষ হয়, তা বুঝতে পারিস না!

বেচারী বাবু লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়। আমি হেসে বলি—অপু ঠিকই বলেছে, গল্পটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি।

—হয় নি তো! তাই বলুন। এবারে বাবু জোর পেয়েছে।

আবার একটু হেসে আমি শুরু করি—বিশ্বনাথ দণ্ডপাণিকে কতখানি ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তার একটা উদাহরণ আছে।

—কি রকম? বাবলি জিজ্ঞেস করে।

আমি উত্তর দিই—মহাদেবের ছেলে কার্তিক চিরকালের অহঙ্কারী। কেনই বা হবেন না! তার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তিনি শিবদুর্গার ছেলে, আবার দেবসেনাপতি। তাই একদিন তিনি দণ্ডপাণিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না। ব্যস, দণ্ডপাণি তাঁকে কাশী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এজন্য বিশ্বনাথ দণ্ডপাণিকে কিছু বলা তো দূরের কথা, বরং তাঁকে সমর্থন করলেন। কারণ আনন্দকানন কাশীধামে অহঙ্কারীর স্থান নেই।

আর তাই কাশী এসে প্রথমে দণ্ডপাণিশ্বরের পূজো করতে হয়, নইলে বিশ্বেশ্বর পূজা গ্রহণ করেন না।...কিন্তু আর কাশীর কথা নয়, সুধাংশুরা এসে গিয়েছে। চলো, বাইরে যাওয়া যাক।

ওরা সানন্দে সঙ্গী হয়। আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে।

॥ আট ॥

মন্দিরের ভজন কিম্বা মসজিদের আজান নয়, আজ সকালে ঘুম ভাঙল চিৎকার ও চেঁচামেচিতে। আমি বলছি চেঁচামেচি, কিন্তু ওঁরা বলবেন কথাবার্তা, অথবা ভ্রমণের ভূমিকা। হ্যাঁ, ওঁরা আজ বেড়াতে যাচ্ছেন, এলাহাবাদ। বরুণা ট্র্যাভেল্স-এর কণ্ডাক্টেড বাসট্যুর। সকাল সাতটায় বাস ছাড়বে, ফিরে আসতে রাত দশটা। ভাড়া জনপ্রতি সত্তর টাকা।

সকাল সাতটায় বাস। সুতরাং ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয়েছে স্নান, সাজগোজ আর গোছগাছের পালা। আর তাতেই আমদের ঘুম গিয়েছে টুটে। কেনই বা টুটবে না। ওরা যে সংখ্যায় দশ-বারোজন। তার মধ্যে আবার বাচ্চা ও মহিলারাই দলে ভারী।

বেড়াতে এসে ঘুমিয়ে কাটানো ঠিক নয়। তার ওপরে আবার কাশী দর্শনের শ্রেষ্ঠ সময় সকাল। তখন কাশীর পথে যেমন তাড়াতাড়ি পদচারণা করা যায়, তেমনি মন্দিরেও ভিড় হয় না। কয়েকবছর আগে একবার কাশী এসে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি নিবাসে ছিলাম। আলোক মহারাজ ছিলেন অদ্বৈত আশ্রমে। ভোরবেলা যে কাশী দর্শনের শ্রেষ্ঠ সময় আমি তাঁর কাছেই প্রথম শুনি। শুধু শোনা নয়, তাঁর সঙ্গে আমিও রোজ ভোরে বেরিয়ে পড়তাম কাশীর পথে। শান্তিতে দু-চারটি মন্দির দর্শন করে আমরা গিয়ে গঙ্গাতীরে বসতাম। বসে বসে কাশীকে দেখতাম। ভারী ভাল লাগত। প্রভাতী সূর্যের প্রথম আলোয় তখন গঙ্গার বুকে আর মন্দিরের চূড়োয় চূড়োয় একটা রোমাঞ্চকর মায়াময় পবিত্র পরশ। আর কাশী সত্যই বিশ্বনাথের আনন্দনগরী।

এবারে যাদের সঙ্গে কাশী এসেছি, তাবা এসব কথা বিশ্বেস করেও ভোরবেলা বের হতে সম্মত নয়। কারণ এরা শুধু কাশীদর্শন করতে আসে নি, সেই সঙ্গে একটু বিশ্রামও করে নেবে। কিন্তু প্রয়াগযাত্রীদের চেঁচামেচির জন্য আজও মৌঘুমটা মাটি হল। হোটেলের কিচেন খোলে নি বলে মনোরঞ্জন বাইরে থেকে চা নিয়ে এলো। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আমরা আজকের ভ্রমণসূচী স্থির করে ফেলি।

আজ আমরা সারাদিনের জন্য একটা নৌকা ভাড়া করব। প্রাতরাশ সেরে সকাল দশটায় নৌকোয় উঠলে দশাশ্বমেধ থেকে অসিঘাট অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের ঘাটগুলি দর্শন করে একটার মধ্যে ফিরে আসতে পারব। স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে আবার বিকেল তিনটেয় নৌকোয় উঠে দশাশ্বমেধ থেকে রাজঘাট মানে উত্তরের সব ঘাট দেখে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ দশাশ্বমেধে ফিরে আসব।

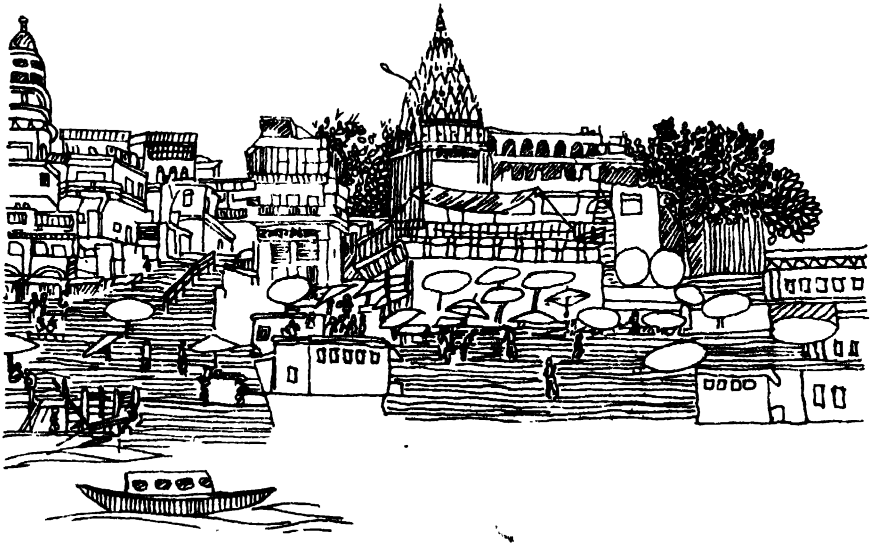
দশটার কয়েক মিনিট আগেই ঘাটে আসা গেল। ঘাটে মন্দিরের গায়ে বড় বড় করে লেখা 'প্রয়াগ ঘাট'। তবু একে কেউ বড় একটা ও-নামে ডাকেন না। দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরাংশ রূপেই বিবেচনা করেন। ঘাটের এই মন্দিরটিতে পুজোর পাটও চুকেছে বহুদিন। এখন এটি মাঝি-মাল্লাদের বৈঠা ও পাল প্রভৃতি রাখার

গুদাম। ঘাটটিও বারাণসীর গঙ্গায় নৌকাবিহারের প্রধান জেটি।

তাই এখানে অনেক নৌকো। নানা আকারের নানা রকমের নৌকো। পানসি থেকে হাউসবোট। হাউসবোটগুলিতে অবস্থাপন্নরা কাশীদর্শনে এসেছেন। ধর্মশালা কিম্বা হোটেলে না উঠে গঙ্গাবক্ষে রাত্রিবাস করছেন। কি জানি, আমার পিতামহের পিতামহ স্বর্গীয় গঙ্গাধর হয়তো এ ঘাটেই তাঁর বজরা রেখে সস্ত্রীক বাবা বিশ্বনাথের সামনে ধর্ণা দিয়েছিলেন। আর তা হলে, এ ঘাটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের।

আমার সহযাত্রীরা যত উৎসাহের সঙ্গেই নৌকোয় উঠে বসুক, তাদের অধিকাংশই কিন্তু সাঁতার জানে না। আর যে ক'জন জানে বলে দাবী করছে, তাদেরও বোধকরি আমার মতো অবস্থা। দীর্ঘকাল জলে না নামায় সেই জানা প্রয়োজনে কতটা কাজে আসবে নিজেরই জানা নেই। তবু নৌকোয় উঠে ওদের উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু থাক্ গে, অপ্রিয় কথা মনে করিয়ে ওদের আনন্দ নষ্ট করা উচিত হবে না।

মাঝি নৌকো ছাড়েন। কয়েক মিনিটেই নৌকো মূল-দশাশ্বমেধ ঘাটের সামনে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে সুপরিচিত কাশীর সেই ছবিখানি আমার সামনে দৃশ্যমান হয়। সেই নৌকোর সারি আর স্নানার্থীদের ভিড়, ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে দুটি স্তরে সুবিশাল ঘাট, ঘাটের ওপরে পূজারী ও পাঠকদের আসর, মন্দির আর অট্টালিকার সারি।



—আচ্ছা জেঠু, সত্যই কি এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল?

অপুর প্রশ্ন শুনে ঘাটের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তার দিকে তাকাতে হয়। একটু হেসে বলি—পুরাণ তো তাই বলে।

—তাহলে একটু বলুন না সেই যজ্ঞের কথা।

—বলব কিন্তু এখন নয়, সন্ধ্যের পরে। যেমন গতকাল হোটেলে বসে বলেছি। এখন বরং অন্যকথা বলছি।

—তাই ভাল। বাবু হাততালি দিয়ে ওঠে।

তবু আমি কথা শুরু করতে পারি না। ধীরেন বলে—তাহলে তো আমরা আপনার পুরাণকথা শুনতে পাব না।

—কেন পাবে না। তোমরা কেনা-কাটা না করে সন্ধ্যের সময় আমাদের সঙ্গে হোটেলে থেকো, তাহলেই শুনতে পাবে।

বাবলার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। আর হাসি থামতেই আমাদের সান্ধ্য-মজলিসের একমাত্র লেডি-মেম্বার বাবলি বিরক্ত কণ্ঠে আমাকে বলে—জেঠু! তুমি বাবার কথা ছেড়ে দাও, যা বলবার বলতে শুরু করো।

অতএব শুরু করি—দশাশ্বমেধ ঘাট ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের কেন্দ্রভূমি। এমন ঐতিহ্যময় সুবিশাল ও সুন্দর ঘাট আর কোথাও আছে বলে জানা নেই আমার। শেষরাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় সারা বছর জুড়েই এখানে ভিড় লেগে আছে। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বনাথ মন্দিরের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ প্রতিদিন এখানে আসেন। স্থানীয়দের কথা ছেড়েই দিলাম, যাঁরা তীর্থ করতে কাশী আসেন, তাঁরাও প্রতিদিন বিশ্বনাথ দর্শন করেন না কিন্তু কাশী এসে দৈনিক অন্তত একবার এ ঘাটে আসেন না, এমন যাত্রী খুঁজে পাওয়া ভার। তাছাড়া যাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই, তাঁদেরও এখানে এসে বসতে নেই কোন বাধা। তাই ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান, শ্বেতাঙ্গ পীতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সবারই কাশীতে সবচেয়ে প্রিয়স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাট জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক সহমর্মীতার আদর্শস্থল।

—এখানে কি মন্দির ও কোন্ কোন্ বিগ্রহ আছে? আমি থামতেই মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—মন্দির বলতে গতকাল যে শীতলা মন্দিরটি দেখেছো, সেটাই প্রধান। আর বিগ্রহ বলতে তিনটি পৌরাণিক লিঙ্গমূর্তি—দশাশ্বমেধেশ্বর, শূলতঙ্কেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর।

—আচ্ছা, ব্রহ্মার নির্দেশে কি রাজা দিবোদাস সত্যই এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন? ছেলে অপুর প্রশ্নটাই বাবা সুধাংশ অন্যভাবে উপস্থাপিত করে।

একটু হেসে বলি—দেখো, এটা পুরাণের কাহিনী, কাশীখণ্ডের কথা। সুতরাং সত্য-মিথ্যে যাচাই করতে যাওয়া অর্থহীন। তবে কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে, রাজা দিবোদাস এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন আর শিব এখানে ব্রহ্মেশ্বর নামে চিরবিরাজমান।

—কিন্তু এটা কি ঐতিহাসিক সত্য? টুকু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—বললাম তো, পুরাণের কাহিনী।

—তার মানে সত্যি নয়?

—না, না, তা হবে কেন? কেবল কল্পনাকে আশ্রয় করেই পুরাণ প্রণীত হয় নি। পুরাণে প্রচুর ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জয়সওয়ালজী বলেছেন, ভারশিব নামে জনৈক নাগনৃপতি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এখানে পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন। আর তার পর থেকেই সেই পবিত্র যজ্ঞস্থলের

নাম হয় দশাশ্বমেধ।

ইতিমধ্যে মাঝি ঘাটের ঠিক সোজাসুজি এসে নৌকোখানিকে অচল করেছেন। উদ্দেশ্য গঙ্গাবক্ষ থেকে আমরা যাতে ঘাটটিকে ভাল করে দেখতে পারি। আমরা দেখি, ভারী সুন্দর। যেমন বিশাল তেমনি বৈচিত্র্যময়। ঘাটে দাঁড়িয়ে ঘাটের এ রূপটি দেখা যায় না।

ঘাটে সংখ্যাতীত স্নানার্থী। কেউ হাঁটুজলে, কেউ কোমরজলে কেউবা গলাজলে। কেউ সূর্যপ্রণাম করছেন, কেউ অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল তুলে নিজের মাথায় ঢালছেন কেউবা ডুব দিচ্ছেন। কেউ সাঁতার কাটছেন কেউ মন্ত্রপাঠ করছেন কেউবা গান গাইছেন।

এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন ক্ষত্রিয় আছেন বৈশ্য আছেন শুদ্র আছেন, হিন্দু আছেন মুসলমান আছেন শিখ আছেন খ্রীষ্টান আছেন, ভারতীয় আছেন অভারতীয় আছেন, নারী আছেন পুরুষ আছেন। জগতের যতো ব্যবধান সব গিয়েছে ঘুচে এই মহামানবের গঙ্গাতীরে।

আর ঘাটের ওপরে, গঙ্গার পারে পারে? সারি সারি বৈঠক বসেছে। কোনটি তালপাতা কিম্বা বাঁশের চটার ছাতার নিচে, কোনটি বা আকাশতলে। কোথাও পুজো-পার্বণ, কোথাও শ্রাদ্ধবাসর, কোথাওবা পাঠের আসর। কোথাও রামায়ণ, কোথাও মহাভারত, কোথাওবা গীতাপাঠ। সব মিলিয়ে যেন বিশাল পর্দার ওপরে ভারতীয় সংস্কৃতির একখানি জীবন্ত ছবি—রঙীন চলচ্চিত্র।

এ দেখার শেষ নেই। আর সে কথাটি মাঝিভাই বেশ ভাল করেই জানেন। তাই তিনি নিঃশব্দে বৈঠা বাইতে শুরু করে দিলেন। নৌকো দশাশ্বমেধ ছাড়িয়ে চলল এগিয়ে।

আমি কিন্তু মনে মনে দশাশ্বমেধের কথাই ভেবে চলি। আজকের নয়, দেড়শ' বছর আগের দশাশ্বমেধ। জেম্‌স প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০) নামে জনৈক বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সরকারী কাজে কয়েক বছর কাশীতে কাটিয়েছেন। তিনি কাশীর জনগণনা করেন এবং কাশীর কয়েকটি জায়গার ছবি আঁকেন। সেইসব ছবি এখন অমূল্য সম্পদ। তারই একখানি ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠেছে।

১৮২৭ সালে দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপারে বসে প্রিন্সেপ সাহেব সেই ছবিখানি এঁকেছেন। ছবিখানির নাম 'Panoramic view of the Holy City of Benares' সাদা-কালো ছবি। অবশ্য ছবি না বলে 'স্কেচ্' বললেই ভালো বোঝা যাবে। স্কেচ্‌খানিতে 'গঙ্গা' যাচ্ছে বয়ে। গঙ্গার বুকে বহু নৌকা, ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ধরনের নৌকা। মাস্তুলওয়ালা পালতোলা জাহাজের মতো বড় নৌকা থেকে এক বৈঠার ডিঙ্গি। কোনটি ভেসে চলেছে, কোনটি ঘাটে মাল খালাস করছে, কোনটি বা মালপত্র নিয়ে রওনা হয়েছে। তারই মধ্যে গরুর গাড়ি ও মানুষ নিয়ে খেয়ানৌকো পারাপার করছে। আবার একটা হাতি হাওদায় লোকজন নিয়ে গঙ্গা পার হচ্ছে।

তখনও দশাশ্বমেধের অপর তীরে বসতি নেই। কেবল কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। বারাণসী যাত্রীদের অস্থায়ী শিবির। কেউ রান্না করছে, কেউ গঙ্গাস্নান করে নিচ্ছে, কেউবা কাপড় কাচছে।

বসতিহীন গঙ্গাতীরে বালির ঢিবি আর কাঁটাঝোপে ভরা পতিত জমি। তারই মাঝে একটা মাটির পথ। পথে পথচারী রয়েছে। মালবোঝাই গরুর গাড়ি আর যাত্রী বোঝাই পাল্কি রয়েছে। অর্থাৎ কাশীতে যাত্রী যাতায়াত করছেন। তাঁরা এখানে এসে খেয়া ধরেন।

যাতায়াতের এই পথটি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয় নি গঙ্গা ও মহানগরী কাশীধামের। আর তাই প্রিন্সেপ সাহেবের স্কেচ্‌খানির কথা মনে পড়ে গেল আমার।

মনে পড়ছে আরও একজনকে। তিনি বিশ্ববিখ্যাত সুসাহিত্যিক ও পরিব্রাজক মার্ক টোয়াইন। গঙ্গার বুকে বসে তিনি কাশীর যে রূপ বর্ণনা করে গিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

"The Ganges front is the Supreme showplace of Benares. Its tall bluffs are solidly caked from water to summit, along a stretch of three miles, with a splendid jumble of massive and picturesque masonry, a bewildering and beautiful confusion of stone platforms, temples stair flights, rich and stately palaces—nowhere a break, nowhere a glimpse of the bluff itself; all the long face of it is compactly walled sight by this crammed perspective of platforms, soaring stairways, sculptured temples, majestic palaces, softening away into distances; and there is movement, motion, human life everywhere, and brilliantly costumed-streaming in rainbows up and down the lofty stairways, and massed in metaphorical gardens on the miles of great platforms at the river's edge."

—দাদা কি ভাবছেন?

টুকুর কথায় আমার ভাবনা ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি বলি—কাশীর গঙ্গা আর কাশীকে দেখছিলাম।

—সে তো আমরাও দেখছি। কিন্তু আমরা যে কিছুই জানি না, তাই বুঝতে পারছি না। আপনি একটু বলুন না কাশীর গঙ্গা আর তার ঘাটের কথা।

আপত্তি না করে আমি শুরু করি—কাশীতে গঙ্গাতীরে পাঁচটি প্রধান তীর্থ। ভক্তযাত্রীরা অনেকেই পায়ে হেঁটে এই তীর্থগুলি দর্শন করেন। সেই পরিক্রমাকে বলে পঞ্চতীর্থ যাত্রা। দশাশ্বমেধ হল পঞ্চতীর্থের দ্বিতীয় তীর্থ। প্রথম তীর্থ অসি-সঙ্গম।

আমরা এখন অসিঘাটে চলেছি অর্থাৎ দ্বিতীয় তীর্থ থেকে প্রথম তীর্থে যাচ্ছি। আমরাও পরিক্রমা করছি তবে পায়ে হেঁটে নয়, নৌকো চড়ে।

একটু থেমে মাঝিকে বলি—ভাই, আমার সঙ্গীরা সবাই এই প্রথম কাশীতে এসেছে। চলতে চলতে আপনি একটু ঘাটগুলোর কথা বলে দেবেন।

মাঝি মাথা নেড়ে বলতে থাকেন—ঐ দেখুন, শীতলা ঘাট। দশাশ্বমেধের পাশেই পাথর দিয়ে বাঁধানো সুন্দর ঘাট। ঘাটের ওপরে মন্দির। মন্দিরে শীতলেশ্বর মহাদেব ও মা-শীতলা বিরাজ করছেন। বেশ জনপ্রিয় ঘাট। দেখুন, কত যাত্রী স্নান ও তর্পণ করছেন।

আমরা দেখি। শুধু ঘাট ও মন্দির নয়, সেই সঙ্গে যাত্রীদেরও। তীর্থ দেবতার হলেও তা মানুষের জন্যে। মানুষকে নিয়েই তীর্থ। মানুষ আছে বলেই দেবতা রয়েছেন।

একটু বাদে মাঝি আবার বলে ওঠেন—সামনে অহল্যাবাঈ ঘাট। তাড়াতাড়ি তাকাই। পাথর দিয়ে বাঁধানো বেশ বড় ঘাট। ঘাটের ওপরে মন্দির ও কয়েকটি পাকা বাড়ি, বেশ বড়-বড়। কোনটি প্রাসাদ, কোনটি নহবৎখানা, কোনটিবা ধর্মশালা অথবা পূজারী ও সেবকদের কোয়ার্টার্স। দু'শ' বছর আগে তৈরি হলেও বেশ অক্ষত। আর সুন্দর তো বটেই।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ একত্রিশ বছর (১৭৬৪-১৭৯৫ খ্রীঃ) ইন্দোরের সিংহাসনে সমাসীনা ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের সংস্কারসাধন করেছেন। আগেই বলেছি কাশীর বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দিরও তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। সোমনাথ মন্দির থেকে কেদারনাথের পথ, কত ঘাট কুণ্ড ধর্মশালা ও অন্নসত্র প্রভৃতি নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছেন, তার হিসেব দেওয়া কঠিন। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

অহল্যাবাঈ ঘাট ছাড়িয়ে আসতেই মাঝি বললেন—এটা চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট। আপনাদের বঙ্গাল মুলুকের মহারাজা প্রতাপাদিত্য এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। ঘাটের ওপরে প্রতাপাদিত্যের তৈরি দুর্গা ও ভদ্রকালীর মন্দির। ভদ্রকালীর মূর্তিটিও প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত। দুর্গা মূর্তিটি আগে বড়ই বৈচিত্র্যময়ী ছিলেন। কারণ চৌষট্টি যোগিনী তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন এখানে একটিও যোগিনী মূর্তি নেই। হয় ভেঙে ফেলা হয়েছে, না হয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এখনও এ ঘাটের নাম চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট।

—কিন্তু মহারাজা প্রতাপাদিত্য নির্মিত মন্দির ও ঘাট এখনও এমন অক্ষত? মাঝির কথা শুনে মনোরঞ্জন প্রশ্ন করে।

মাঝির বোধকরি এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। তাই মনোরঞ্জনের সংশয় নিরসনের জন্য বলি—ঘাট ও মন্দির মহারাজা প্রতাপাদিত্য তৈরি করে দিলেও, পরবর্তীকালে সংস্কারসাধন করা হয়েছে। তোমরা জানো যে ১৬১২ সালে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লোহার খাঁচায় পুরে ঢাকা থেকে আগ্রা নিয়ে যাবার পথে কাশীতে তাঁর জীবনাবসান হয়। সুতরাং প্রতাপাদিত্য এ মন্দির ও ঘাট তৈরি করেছিলেন সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে। তারপরে তিনশ' বছরে অন্তত একবার এখানে ধর্মান্ধ শাসক আঘাত হেনেছেন কিন্তু ধার্মিক ধনীগণ কতবার সংস্কারসাধন করেছেন জানা নেই আমার। আমি কেবল শুনেছি, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতাপাদিত্যের বংশধর টাকীর জমিদার সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী এই মন্দির ও ঘাটের আমূল সংস্কার করিয়ে দিয়েছেন।

—এখানে পুজো হয় না? অপু জিজ্ঞেস করে।

—হয় বৈকি! আশ্বিন মাসে নবরাত্রির সময়ে এখানে মহাসমারোহে চৌষট্টি যোগিনীর পূজা হয়। তাছাড়া সন্তান কামনায় মেয়েরা এখানের ষষ্ঠীতলায় পুজো দেন আর মায়েরা সন্তানের মঙ্গল চেয়ে চৌষট্টি যোগিনীর কৃপা প্রার্থনা করেন।

এই মন্দিরে মেয়েদেরই বেশি ভিড়।

—কিন্তু পুজো দূরের কথা, আমরা যে দর্শন পর্যন্ত করলাম না। টুকুর স্বরে অভিযোগ।

শান্ত স্বরে সুধাংশু সান্ত্বনা দেয়—করবে। পাণ্ডাজীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে আমরা গাড়ি নিয়ে একদিন এখানে আসব।

আমার কথাটা বোধকরি কর্ণধার মহাশয়ের ভাল লাগে নি। তাই সুধাংশুর কথা শেষ হতেই সে যোগ করে—কেবল মেয়েরা নন, ছেলেরাও এ মন্দিরে আসেন। বিশেষ করে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। দলে দলে ভক্ত দোলায় করে সুসজ্জিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নিয়ে গান গাইতে গাইতে এ মন্দিরে এসে দুর্গা ও ভদ্রকালীকে দর্শন করেন। দোলপূর্ণিমার এই সান্ধ্য উৎসবকে বলা হয় 'ধুরড্ডি'।

মাঝি থামতেই তীরের দিকে ইসারা করে ধীরেন জিজ্ঞেস করে—ওটা কি মন্দির ?

—অমরেশ্বর বা অমরনাথজীর মন্দির। আব ঐ ঘাটদুটির নাম নারদ ঘাট ও মান-সরোবর ঘাট।

—মান-সরোবরের সঙ্গে রাধার মান ভঞ্জনের কোন সম্পর্ক আছে কি? সুধাংশু সহাস্যে বলে।

—না। মহারাজা মানসিংহ ওখানে একটি সরোবব খনন কবে দিয়েছিলেন বলে সেটির নাম মান-সরোবর। এটি সেই সরোবরে যাবার ঘাট।

•

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপবে মাঝি আবার বলেন—এটি রাণা ঘাট, এর পবেরটি মুন্সীঘাট।....

—দ্বাবভাঙ্গা ঘাটও বলা হয়। আমি যোগ কবি।

ওরা আমার দিকে তাকিযে রয়েছে। অতএব আমাকে আবার মুখ খুলতে হয়—শ' চাবেক বছর আগে উদয়পুবের মহারাণা এই বাণামহল ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে তাঁর জনৈক বংশধব ঘাটটিব সংস্কাব করেছেন।

—আর মুন্সীঘাটকে কেন দ্বাবভাঙ্গা ঘাট বলা হয জেঠু! বাবু জিজ্ঞেস করে।

—মুন্সী শ্রীধর নামে জনৈক স্থানীয় ধনী প্রথম এই ঘাটটি তৈবি কবেছিলেন। কিছুকাল পরে ঘাটটি ভেঙ্গে যায়। তখন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা গঙ্গাতীরসহ ঘাটটি কিনে নিয়ে নতুন ভাবে তৈরি করে দেন। কিন্তু সে ঘাটও এখন বহু জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে।

আমরা গল্প করছি আর সেই সঙ্গে নৌকো চলেছে এগিয়ে। একটু বাদে ধোবীঘাটের সামনে আসি। বাঁধানো নয়, কাঁচা ঘাট। গঙ্গাতীরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সব জায়গাতেই জোর কাচাকাচি চলেছে। বোধকরি শতাধিক রজক-রজকিনী সারি বেঁধে কাপড় কেচে চলেছেন।

মাঝি বলেন—এই ঘাটেব পাবেই বঙ্গালী টোলা।

আমি মাথা নেড়ে বলি—বাঙ্গালীরা পুরুষাণুক্রমে বাস করছেন এখানে।

—তার মানে আমরা তিল-ভাণ্ডেশ্বরের কাছাকাছি এসে গেছি? অপু জিজ্ঞেস করে।

মাঝি উত্তব দেন—জী হাঁ। এখানে নেমে তো বটেই, মান-সরোবর ঘাটে নেমেও

তিল-ভাণ্ডেশ্বরে যাওয়া যেত।

—ওটা কি ঘাট? কয়েকজন স্নানরত মানুষকে দেখে বাবলা প্রশ্ন করে।

সেও বুঝতে পেরেছে যে কাশীর গঙ্গাতীরে প্রতি অংশই কোন না কোন ঘাট, তা সে বাঁধানো হোক আর কাঁচা হোক।

একটু দেখে নিয়ে মাঝি উত্তর দেন—এটা সোমেশ্বর ঘাট। ঘাটটি কাঁচা হলেও ঘাটের ওপরে সোমেশ্বরদেবের পাকা মন্দির রয়েছে। আর তার পরের অংশটির নাম চৌকিঘাট। ঘাটের ওপর দেখুন, একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ।

আমরা তাকাই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

মাঝি বলছেন—গাছটির গোড়া বাঁধানো। সেখানে নাগ দেবতার মূর্তি আছে। রয়েছে একটি কুয়ো, নাগকূপ। শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমীতে বেশ বড় মেলা বসে এখানে।

আমাদের নৌকো কেদারঘাটের সামনে আসে। একি! মাঝি নোঙর করবেন নাকি? হ্যাঁ, তাই তো। ঘাটের সঙ্গে নৌকো বাঁধলেন। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলেন—যান, দর্শন করে আসুন।

এটাই বোধকরি নিয়ম। কারণ আরও কয়েকখানি নৌকো ঘাটে বাঁধা রয়েছে। ওপরে ঘাটে ও মন্দিরে বেশ কয়েকজন যাত্রীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখছি।

দশাশ্বমেধের মতো না হলেও বেশ বড় ঘাট। ধাপে ধাপে সিঁড়ি গঙ্গার বুক থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে। বহু সিঁড়ি। ঘাট অনেক উঁচুতে।

আর তাই টুকু ও মনোরঞ্জনের ইচ্ছে আমি নৌকোতেই বসে থাকি। বলে—আপনি তো অনেকবার দর্শন করেছেন। আপনার বুকে 'পেসমেকার' বসানো, আপনার এতগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গা উচিৎ হবে না।

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যই অনেক সিঁড়ি। তাহলেও ছেলে-মেয়ের জন্য ওদের আপত্তি ধোপে টিকল না। তারা বলে—এ ক'টা সিঁড়ি ভাঙলে জেঠুর কোন ক্ষতি হয় না। নইলে কাল-পরশু দশাশ্বমেধে গঙ্গাজল স্পর্শ করল কেমন করে? আজও তো দশাশ্বমেধে আবার সিঁড়ি ভাঙতে হবে।

মৃদু হেসে সুধাংশু বলে—ওরা আপনাকে ছেড়ে ওপরে যাবে না। চলুন, ধীরে ধীরে যাবেন।

আমারও তাই ইচ্ছে। ঘাটে এসে বাবা কেদারেশ্বরকে দর্শন করব না! আমি উঠে দাঁড়াই। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবু ও বাবলি বলে ওঠে—জেঠু, তুমি আমাদের কাঁধে হাত রাখো, আমরা তোমাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি।

হেসে বলি—তার দরকার হবে না। আমার সিঁড়ি ভাঙা বারণ নয়, তবে ডাক্তার ধীরে ধীরে ভাঙতে বলেছেন।

—তাহলেও তুমি আমাদের কাঁধে হাত রাখো।

তাই রাখতে হয়। এবং একসময়ে ওরা আমাকে নিয়ে ওপরে পৌঁছয়।

টুকু বলে—এবারে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন।

আমি বসে পড়ে ওদের বলি—তোমরা ভাল করে সব দেখে নাও। আমি একটু পরে আসছি।

ওরা আপত্তি করে না, এগিয়ে যায়। আমি বসে বসে দেখতে থাকি। আগে

গঙ্গার দিকে তাকাই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কারণ এই ঘাট থেকে কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার অর্ধচন্দ্রাকার রূপটি ভারী ভাল দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে গঙ্গা এখানে এসে সোজাসুজি উত্তর-প্রবাহিণী হয়েছে। ফলে এ ঘাটে স্রোত বেশ প্রবল। জলও ভারী পরিস্কার। আর ঘাটটির কথা তো আগেই বলেছি। বেশ বড়। কারণ কিছুকাল আগে পাশের বিজয়নগর ঘাটটিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখন দুটি ঘাট নিয়েই কেদারঘাট। তাই বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা এ ঘাটেই নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন। তার ওপরে তীর্থযাত্রীরা তো রয়েছেনই। ফলে সর্বদাই বেশ ভিড়। অবশ্য বর্ষাকালে শুনেছি স্রোত এত প্রবল থাকে যে খুব সাবধানে স্নান করতে হয়।

ওরা মন্দিরের ভেতর চলে গিয়েছে। আমিও উঠে দাঁড়াই। সামনেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। বদ্রীনাথের নীলকণ্ঠ কাশীতে এসে কেদারনাথের হয়েছেন। আমি দর্শন করি, প্রণাম করি।

আমরা গঙ্গা বেয়ে এসেছি বলে আগে নীলকণ্ঠের সঙ্গে দেখা হল। শহরের দিক থেকে এলে সব শেষে দেখা হত তাঁর সঙ্গে। ইনিও শুনেছি ভারী জাগ্রত দেবতা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরা চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় এখানে আসেন। নীলকণ্ঠের সামনে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। তাছাড়া শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এ মন্দিরে বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটে।

শহরের দিক থেকে মন্দিরে আসার প্রধান তোরণটি বেশ বড়। বহু যাত্রী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন।

তোরণের সামনে মূল-মন্দির। মন্দিরের চারিপাশে বেশ প্রশস্ত পরিক্রমা-পথ। আমার সহযাত্রীরা মন্দির দর্শন করে এখন পরিক্রমা করছে।

আমি গর্ভগৃহের সামনে আসি। গর্ভগৃহের দ্বারে দুপাশে দুটি অপূর্ব দ্বারপাল মূর্তি। মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে সকাইকে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়। এই মূর্তি দুটির দিকে না তাকিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

ঘাটটি যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, মন্দিরের ভেতরটা কিন্তু মোটেই তা নয়। অন্যান্য প্রাচিন শিবমন্দিরের মতই সংকীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। দুধ জল ফুল ও বেলপাতা ইত্যাদিতে স্যাঁতস্যাঁতে। তাছাড়া মন্দিরের ভেতরে জায়গাও বড় কম। বেশি ভিড় যখন হয়, তখন বোধকরি বিগ্রহকে বাঁচিয়ে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রণাম ও পরিক্রমার পরে ঘাটে এসে দেখি ওরা সবাই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, নৌকোর মাঝিও যেন কখন এসে যোগ দিয়েছেন ওদের সঙ্গে। আর স্বয়ং পূজারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাশে।

আমি কাছে আসতেই অপু বলে—জেঠু, বসে পড়ো। ঠাকুরমশাই কেদারনাথজীর গল্প বলবেন। আমরা তোমার জন্য বসে আছি।

অপুর পাশে বসে পড়ে সহাস্যে বলি—আরও একটু বসতে হবে পূজারীজীকে।

—কেন ?

—কেদারনাথজীর গল্প শোনার আগে আমি তোমাদের একটা গল্প বলব। আর

সেটি গল্পের মতো হলেও সত্য ঘটনা।

—কার গল্প?

—স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের।

—ঠিক হ্যায়, বোলিয়ে। পূজারী সম্মত হয়ে আসন গ্রহণ করেন।

আমি বলতে থাকি—স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন। সেই বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে তিন সপ্তাহের জন্য তিনি কাশী এসেছিলেন। তখন একদিন এই মন্দিরের বৃদ্ধ মোহন্তজী স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। স্বামীজি সামনে আসতেই তিনি তাঁকে 'নমো নারায়ণ' বলে বন্দনা করলেন। তারপরে স্বামীজিকে বললেন—আপনি সাক্ষাৎ শিব। আপনি জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। আমেরিকা ও য়ুরোপে আপনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং যেসব কাজ করেছেন, আজ পর্যন্ত আর কেউ তা করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য সমাজের সামনে আপনি যেভাবে হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাতে প্রত্যেক হিন্দু আপনাকে ভারতের গৌরব বলে মনে করে। বেদধর্মের গূঢ় রহস্যসমূহ অন্তরে উপলব্ধি করে আপনি যেমন সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে বিশ্বসভায় ব্যাখ্যা করেছেন, তার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে আমরা সাধুসমাজও আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

আশি বছর বয়সী পলিতকেশ মহাস্থবির মোহন্তজীর কথা শুনে স্বামীজি লজ্জিত ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। নিতান্ত উদ্বেলিত চিত্তে তিনি শিশুর মতো বলতে থাকলেন—আমি কিছুই করি নি। সবই ঈশ্বরের কৃপা আর আমার গুরুর আশীর্বাদ।

তাঁর দু-চোখে অশ্রুধারা বইতে থাকল। আর তা দেখে মোহন্তজীসহ উপস্থিত সকলেই কেঁদে আকুল হলেন।

আমি থামতেই পাণ্ডাজী বলেন—আপনাকে ধন্যবাদ। ঘটনাটি জানা ছিল না আমার। একবার থামেন তিনি। তারপরে আমাদের সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করেন—

হিরণ্যগর্ভাচার্য নামে একজন ঋষি কাশীতে বাস করতেন। তিনি কেদারনাথজীর খুবই ভক্ত ছিলেন। প্রতিবছর কেদারনাথ যাত্রায় যেতেন।

বশিষ্ঠ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই ঋষির কাছে পড়াশুনা করতে এলেন। কিছুদিন বাদেই ঋষির কেদারনাথ যাত্রায় যাবার সময় এলো। তখন ঋষি শিষ্যকে বললেন—আমি এবারে কেদারনাথ যাত্রায় বের হবো, তুমি ততদিন আমার এই আশ্রম রক্ষা করো।

সব শুনে বশিষ্ঠ করুণ কণ্ঠে গুরুদেবকে বললেন—কৃপাময়, কৃপা করে এ দাসকেও সঙ্গী করে নিন। আমি সেই পরাৎপর পরমব্রহ্ম কেদারনাথজীকে দর্শন করে মানবদেহ সার্থক করি।

শিষ্যের ভক্তি দেখে গুরু তাঁকে সঙ্গে নিলেন। গুরু-শিষ্য হিমালয়ের পথে যাত্রা করলেন। বেশ কিছুদিন পথ চলার পরে গুরুদেব পথকষ্টে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলেন। এবং শেষ পর্যন্ত অসিধার নামে একটা জায়গায় পৌঁছে তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন। আর তারপরেই শিষ্য সবিস্ময়ে দেখলেন, শিবদূতগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর গুরুদেবের মরদেহ পুষ্পকরথে করে কৈলাসে নিয়ে গেলেন।

গুরুদেবের আশ্চর্য সদ্গতি দেখে বশিষ্ঠ বড়ই প্রীত হলেন। আর তাই তিনি অর্ধপথে যাত্রা শেষ করে কাশীতে ফিরে না এসে কেদারনাথজীর স্তব করতে করতে

কেদারের পথেই এগিয়ে চললেন। অসংখ্য পাহাড় অনেক নদী ও হিমবাহ অতিক্রম করে একদিন বশিষ্ঠ কেদারনাথধামে উপস্থিত হলেন। নিরাকার পরমব্রহ্মের প্রতীক কেদারনাথ শিলাকে দর্শন করলেন, স্পর্শ করলেন, প্রণাম করলেন।

কল্পবাসী হয়ে বশিষ্ঠ তিনদিন বাস করলেন কেদারনাথধামে। তারপরে ভাবলেন—এটি পরম-পবিত্র তীর্থ হলেও বড়ই শীতপ্রধান। ফল ও জল দুটোই দুর্লভ। অতএব বারোমাস বাস করা সম্ভব নয় এখানে। তাছাড়া কাশীধামের মতো বাসযোগ্য রমণীয় স্থান পৃথিবীতে আর নেই। সুতরাং আমি যতদিন বেঁচে থাকব, কাশীতেই বাস করব। তবে প্রতিবছর চৈত্র পূর্ণিমাতে এখানে এসে কেদারনাথজীকে দর্শন করে যাবো।

ঋষি বশিষ্ঠদেব সারা জীবন ধরে সেই সংকল্প রক্ষা করেছেন। একষট্টি বছর ধরে প্রতি চৈত্র পূর্ণিমাতে তিনি কেদারনাথে উপস্থিত হয়ে কেদারেশ্বরকে দর্শন করেছেন। তাঁর পুজো দিয়েছেন।

কিন্তু তারপরেই তিনি বার্ধক্যের শিকার হলেন। আস্তে আস্তে অচল হয়ে পড়লেন। তাই সেবারে চৈত্র পূর্ণিমা আসছে দেখে বিচলিত বশিষ্ঠ বিলাপ করতে থাকলেন—প্রভু কেদারনাথ, আমার জীবন হরণ না করে তুমি আমাকে এমন অচল করলে কেন? এবারে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করার জন্য যে আমাকে নরকবাসী হতে হবে।

সেইসময় সহসা জনৈক অপরিচিত ব্রাহ্মণ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন—তুমি এমন কান্নাকাটি করছ কেন? কান্না থামিয়ে কিছু খেয়ে নাও। তারপরে জিনিসপত্রে গোছগাছ করে নিয়ে চলো রওনা দেওয়া যাক। আমি তোমাকে কেদারনাথ দর্শন করিয়ে আনব।

কিছুক্ষণ বাদে তাঁরা যাত্রা করলেন। আর তখুনি ভক্তবৎসল করুণাময় কেদারনাথ অদৃশ্যভাবে ভক্ত বশিষ্ঠের দেহে প্রবেশ করে তাঁকে বলবান করে তুললেন। তিনি ব্রাহ্মণের আগে আগে পথ চলতে থাকলেন।

সেবারেও বশিষ্ঠ চৈত্র পূর্ণিমায় কেদারনাথধামে উপস্থিত হয়ে কেদারনাথজীকে দর্শন করতে পারলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বুঝতে পারলেন, তাঁর পক্ষে আর এখানে আসা সম্ভব হবে না। তাই পুজো দিয়ে তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন—প্রভু করুণানিধান, আপনি আপনার প্রিয়তম তীর্থ কাশীধামে প্রকট হয়ে কাশীবাসীদের কৃতার্থ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হল—তথাস্তু।

পুলকিত বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট চিত্তে কাশী ফিরে এলেন। কিন্তু অনেক পুজো আর জপ-তপের পরেও কেদারনাথজীর দর্শন পেলেন না। তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

কয়েকজন বিজ্ঞ কাশীবাসী কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—করুণাময় কেদারনাথ যখন করুণা করে এখানে প্রকট হতে সম্মত হয়েছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে দর্শন দান করবেন।

কিছুক্ষণ বাদে জনৈক সন্ন্যাসী বশিষ্ঠের কুটিরদ্বারে উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খেতে দাও।

বশিষ্ঠ তাঁকে ঘরে বসিয়ে রান্নাঘরে এলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, মাত্র কিছুক্ষণ আগে রান্না করে রাখা খিচুড়ি কেমন যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে।

সামনে অতিথি, ঘরে খাবার নেই। অসহায় বশিষ্ঠ আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এদিকে অতিথি তাঁর দেরি দেখে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। চোখ মুছে বশিষ্ঠ তাঁর কাছে এলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে সবকথা খুলে বলতে হল।

সব শুনে সহাস্যে সন্ন্যাসী বললেন—বেশ, চলো দেখি দেখা যাক, খিচুড়ি কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়?

বশিষ্ঠ অতিথিকে নিয়ে রান্নাঘরে এলেন। অতিথি সহসা সেই খিচুড়ির সামনে বসে পড়ে বশিষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—আমিই কেদারনাথ। এখন থেকে তোমার এই খেচড় অন্নে আমি বারাণসীধামে আবির্ভূত হয়ে রইলাম।

তারপরেই সন্ন্যাসবেশী কেদারনাথ নিজরূপ ধারণ করলেন। অভিভূত বশিষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সস্নেহে টেনে তুলে কেদারেশ্বর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মহাদেবের দেহের স্পর্শে বশিষ্ঠদেব দিব্যদেহ লাভ করলেন।

কেদারনাথ তখন কালভৈরবকে আহ্বান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালভৈরব করজোড়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। কেদারনাথজী তাঁকে বললেন—কালরাজ, আজ থেকে আমি কাশীধামে চিরস্থায়ী হলাম। শত পাপ করলেও কাশীবাসীদের তুমি ভৈরবীযন্ত্রণা দেবে না। আর এখন থেকে কেদারনাথধামে আমাকে দর্শন করলে যে পুণ্য হয়, এখানে আমাকে দর্শন করলেও পুণ্যার্থীরা সেই একই পুণ্যলাভ করবে।

বলা শেষ হতেই কেদারনাথজী বশিষ্ঠদেবের সেই খেচড় অন্নসহ অদৃশ্য হলেন। দেবদেবীরা স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। ঋষি বশিষ্ঠ কেদারনাথজীর পদরেণুরঞ্জিত পুণ্যভূমিতে পুনরায় লুটিয়ে পড়লেন।

থামলেন পাণ্ডাজী। আমরাও বাকহীন। কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে পাণ্ডাজী আবার বলেন—এটি যে করুণাময় কেদারনাথজীর করুণাধন্য পুণ্যপীঠ তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে ধর্মান্ধ আক্রমণকারীদের কবলে পড়ে কাশীর প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বিগ্রহ ও লিঙ্গমূর্তি কোন না কোন ভাবে কলুষিত হয়েছে কিন্তু কেদারনাথজীর লিঙ্গমূর্তি কলঙ্কিত হয় নি।

মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আমি আবার নিষ্কলঙ্ক কেদারনাথকে প্রণাম করি।

॥ নয় ॥

কেদারঘাট থেকে নৌকো ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সামনে এলাম। মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামে দুটি মহাশ্মশান, হরিশ্চন্দ্র ও মণিকর্ণিকা। সেই সত্যযুগ থেকে ভারতবাসী বিশ্বাস করে আসছেন যে কাশীতে প্রাণত্যাগ করলে অক্ষয় মোক্ষলাভ। তাই হরিশ্চন্দ্র ও মণিকর্ণিকা মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামের মোক্ষদ্বার। এখানে কখনও চিতার আগুন নেভে না। এবং এখনও একাধিক চিতা জ্বলছে।

সেই সুদূর অতীত থেকেই 'বার্ধক্যে বারাণসী' কথাটা আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত। অর্থাৎ জগৎ-সংসারে তোমার কাজকর্ম যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি কাশীবাসী হবে। গঙ্গাস্নান আর বিশ্বনাথ দর্শন করে জীবনের বাকি দিনকটি কাটিয়ে দাও। তারপরে একদিন দেহত্যাগ করে মোক্ষলাভ ক'রো। আর তাই বোধকরি রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসীদের জন্য বার্ধক্যাশ্রমটি এখানেই পরিচালনা করছেন।

—আচ্ছা কাশীর দুটি শ্মশানের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পুরনো?

ধীরেনের প্রশ্নে আমার ভাবনা থেমে যায়। উত্তর দিই—হরিশ্চন্দ্র। তাই এটিকে আদি-মণিকর্ণিকা ঘাটও বলা হয়। তুলসীঘাটের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ এবং অসিঘাটের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেকে এখনও মৃত্যুর আগে এখানে দাহ করার বাসনা প্রকাশ করে যান।

—মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলবে না জেঠু! অপু আবদার করে।

মৃদু হেসে বলি—তুমি তো সে গল্প জানো বাবা!

—আমরা জানি না। তুমি গল্পটা বলে ফেল জেঠু! বাবু, বাবলা ও বাবলি একযোগে দাবী জানায়।

বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়। বলি—গল্পটা বেশ বড়। এখন শুরু করলে বাকি ঘাটগুলো দেখতে অসুবিধে হবে। তার চাইতে যখন অসিঘাট থেকে দশাশ্বমেধে ফিরব, তখন গল্পটা বলব। তখন আর ঘাট দেখার পিছুটান থাকবে না।

ওরা আমার যুক্তি মেনে নেয়। অর্থাৎ এখনকার মতো আমাকে নিষ্কৃতি দেয়।

ইতিমধ্যে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি। আর তা খেয়াল হতেই বাবু বলে ওঠে—মাঝিকাকু, তুমি কিছু বলছ না কেন? সামনে ওটা কোন্ ঘাট?

—হনুমান ঘাট। ওখানে হনুমান মন্দির আছে। সে মন্দিরে রয়েছেন ভৈরবেব কুকুর রুরু। তিনিও ভৈরব, কাশীর রক্ষাকর্তা কালভৈরবের আটজন সহকারী ভৈরবের একজন।

মাঝি থামলে আমি যোগ করি—বৈষ্ণব অবতার শ্রীবল্লভাচার্য এই ঘাটের কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাই বল্লভাচার্যের নামে এখানে একটি প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আছে। আর তার পাশেই রয়েছে মহাপ্রভুর বৈঠক।

—মহাপ্রভু মানে শ্রীচৈতন্যদেব? সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

মাথা নেড়ে উত্তর দিই—হ্যাঁ। তুমি জানো যে ব্রজমণ্ডল উদ্ধারের পরে পুরী

ফেরার পথে মহাপ্রভু কয়েকদিন কাশীতে কাটিয়েছিলেন। এখানেই শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। এবং তিনি শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দান করেন।

সুধাংশু মাথা নাড়ে। সে আমার 'মধু-বৃন্দাবনে' বইখানির প্রকাশক। সুতরাং তার একথা অজানা থাকার কথা নয়।

মনোরঞ্জন বলে—মহাপ্রভু কি তার আগেই প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন।

—হ্যাঁ। 'কুম্ভমেলায়' গিয়ে তোমরা সে শিক্ষাস্থলী দর্শন করে এসেছো।

এবাবেও সুধাংশু মাথা নাড়ে। কারণ মনোরঞ্জনের সঙ্গে সেও আমার কুম্ভমেলা দর্শনের অন্যতম সঙ্গী।

আবার হনুমান ঘাটেব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বলি—হনুমান ঘাট এলাকায় এখন বহু দক্ষিণ ভারতীয় মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁরা ওখানে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলায় একটি চমৎকাব মন্দির নির্মাণ করেছেন।

একটু থেমে মাঝি বৈঠা থেকে একহাত তুলে ইশাবা কবে বলেন—ঐ দেখুন, আনন্দময়ী মায়ের ঘাট ও আশ্রম। মায়ের অপ্রকট হবার আগে, বিশেষ করে মা যখন কাশীতে থাকতেন, তখন সারাদিনই ভিড় লেগে থাকত এই ঘাটে। সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীরা এখানে স্নান করতেন।...

ঠিকই বলছেন মাঝি। কে না এসেছেন এ ঘাটে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন থেকে সুপণ্ডিত ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায....

—কিন্তু এখন দেখুন কেমন জনহীন। মাঝি বলছেন—মা দেহ রাখার পরে আশ্রমেব জাঁকজমক ক্রমেই কমে আসছে।

—কথাটা খুবই সত্যি। মা থাকতে যেদিনই আমি এই আশ্রমে এসেছি, মনে হযেছে কোন উৎসব বাড়িতে এলাম। কিন্তু মা অপ্রকট হবাব পবে একদিন এখানে এসে আশ্রমেব হতশ্রী রূপ দেখে এতই কষ্ট পেযেছি যে তারপবে কাশী এলে আমি আব এ আশ্রম দর্শন কবি না। এবারেও আসার ইচ্ছে নেই।

—আপনি না এলে আমরাও আসব না। আর তাই বলছি, একটু মা আনন্দময়ীর কথা বলুন না! অর্চনা অনুরোধ কবে।

হেসে বলি—আমি আব কি বলব, মনোবঞ্জন ও সুধাংশু তো তাঁকে দর্শন করেছে।

টুকু বলে—জানি। কুম্ভমেলায়। আপনি বইতেও সেকথা লিখেছেন। কিন্তু আপনি কি. মা-কে সেই একবাবই দেখেছেন?

—না। আরও একবাব তাঁকে দর্শন কবাব সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

—কোথায়?

—বৃন্দাবনে, ১৯৬৯ সালে। শুধু তাঁকে একা নয়, সেইসঙ্গে তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও।

—কি রকম?

—আমরা বৃন্দাবনে মায়েব আশ্রমে বসে ভজন শুনছিলাম। মা-ও বসেছিলেন সেখানে। হঠাৎ একটা ওযারলেস লাগানো পুলিশের ভ্যান আশ্রমের ভেতরে এসে

একেবারে নাটমন্দিরের সামনে থামল। পেছনে একখানি বিশাল বিদেশী গাড়ি। সবাই তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ত্রস্তপায়ে তিনি উঠে এলেন নাটমন্দিরে। ভজন বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

কেবল বসে রইলেন মা। আর প্রধানমন্ত্রী এসে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। মা সস্নেহে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জগজ্জননী মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইলেন।

কেটে গেল কিছুক্ষণ, কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। তারপরে মা আস্তে আস্তে ইন্দিরার মাথাটি তুলে ধরলেন। ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে একঝুড়ি আপেল নিয়ে একটি লোক ইন্দিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ইন্দিরার লক্ষ্য পড়ল তাঁর দিকে। তিনি লোকটিকে বললেন, ঝুড়িটা মায়ের পায়ের কাছে রাখতে। আবার প্রণাম করলেন। মা সেই ঝুড়ি থেকে একটি আপেল নিয়ে ইন্দিরার হাতে দিলেন। আপেলটি কপালে ছুঁইয়ে তিনি সেটি ব্যাগে পুরে রাখলেন।

মা উঠে দাঁড়ালেন। ইন্দিরা সরে এলেন। মা আসন থেকে নেমে এসে তাঁর একখানি হাত ধরে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশে বললেন—আমার মেয়ে এসেছে। ওকে নিয়ে আমি একটু ঘরে যাচ্ছি। তোমরা ভজন করো।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমবা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছি। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেন মা। ইসারায় জনৈকা ব্রহ্মচারিণীকে কাছে ডাকলেন। বললেন—এই আপেলগুলো রেখে দাও। আজ সন্ধ্যায় কয়েকজন সাধু-মহাত্মাকে ভোজনের জন্য নেমন্তন্ন করেছি। তাঁদের এগুলো পরিবেশন কবো।

প্রধানমন্ত্রী বোধকরি খুশি হলেন। তিনি হাসিমুখে মায়ের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

—আচ্ছা, মা কতদিন মর্ত্যলীলা করেছেন?

—ছিয়াশি বছর, ১৮৯৬ থেকে ১৯৮২।

—আরেকটা কথা দাদা! শুনেছি মা কৃপা করে তাঁর ভক্তদের কাছে নানা রূপে দর্শন দিয়েছেন। আমি থামতেই অঞ্জু জিজ্ঞেস কবে।

কিন্তু আমি কিছু বলবাব আগেই অর্চনা প্রশ্ন করে—কি রকম?

আমি বলি—মা এক-এক সময় তাঁর এক-একজন ভক্তের সামনে এক-এক দেবীমূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন।

—যেমন? টুকু বলে।

—বাংলা ১৩৩৩ সালে ঢাকার শাহবাগে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভক্ত মা আনন্দময়ীকে স্বয়ং সরস্বতীরূপে দর্শন করেছেন।

প্রমথবাবু নামে কলকাতার আরেক ভক্ত ঢাকা গিয়েছেন। মা তখন সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে। প্রমথবাবু সেখানে গেলেন। দেখলেন আনন্দময়ী মায়ের স্বামী ভোলানাথবাবুও রয়েছেন। প্রমথবাবু মনে মনে প্রার্থনা করলেন—মা, তোমাকে আমি ছিন্নমস্তা রূপে দর্শন করবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছি। তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো।

বলা বাহুল্য ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রইল না। সেদিন রাতে ঘোমটা মাথায় দিয়ে মা বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর স্বামী ভোলানাথবাবু সেই বারান্দাতেই তখন ঘুমিয়ে

পড়েছেন। আর প্রমথবাবু খানিকটা দূরে বসে জপ করছেন। রাত বেড়ে চলেছে। চারিদিকে একটা অখণ্ড নীরবতা।

হঠাৎ প্রমথবাবু মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকালেন। সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন মা উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। মাথাটা উল্টে গিয়ে পিঠের সঙ্গে মিশে গেছে।

মায়ের এই ছিন্নমস্তা রূপ দেখে প্রমথবাবু স্তম্ভিত। তারপরেই অন্তর্যামী মায়ের অপার করুণায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

আরও অনেকে মা আনন্দময়ীকে নানা রূপে দর্শন করেছেন। যেমন ১৩৪৬ সালের ২৬শে কার্তিক আশুতোষ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল কালিদাস সেন মাকে দর্শন করেছেন ষোড়শী ভুবনেশ্বরী রূপে। কাশীতে নয়, দেখেছেন বিন্ধ্যাচলে।

আরেকজন ভক্ত মহিলা মা-কে প্রথম সিমলায় দেখেন ১৩২৩ সালে। তিনি গোপালের সেবিকা ছিলেন, প্রতিদিন বাল-গোপালের সেবা-পূজা করতেন। কিন্তু মা-কে দর্শন করার পর থেকে যখনই তিনি গোপালের ধ্যানে বসতেন, মায়ের মুখখানি তাঁর চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠত।

অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত নামে মায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। বহু বছর ধরে মাকে বহুবার দেখার পরে একদিন তিনি মা-কে বললেন—তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি সৎ। এমন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এমন সময় আসবে না যখন তুমি থাকবে না। যদি বলা যায়, তুমি মহামায়া, তুমি কালী কিম্বা দুর্গা, তাহলে তো তোমাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তুমি যে যুগপৎ অসীম ও সীমাবদ্ধ।

অতএব মা কোথাও যান নি, মা ছিলেন, মা আছেন। আছেন বারাণসীর আকাশে আর বাতাসে, আছেন এই গঙ্গা আর তার ঘাটে ঘাটে, আছেন আমাদের মতো অজ্ঞান ও অকর্মণ্য শত সহস্র মানুষের অন্তরে। এসো, তাঁর পরমপ্রিয়া গঙ্গাবক্ষে বসে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই।

মাঝির কথায় আমার কথা থামাতে হয়। মাঝি বলেন—মায়ের আশ্রমের পাশেই মহারাজা চেৎ সিং-য়ের প্রাচীন প্রাসাদ আর তারপরে তুলসী ও অসি ঘাট। আগে তুলসী তারপরে অসি, সঙ্গমে অসিঘাট।

—এই তুলসীঘাট কি কবি তুলসীদাসের নামে? ধীরেন জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। উত্তর দিই। বলি—মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীজির নামেই এ ঘাট। কারণ তিনি এইঘাটে স্নান করতেন। ঘাটের অনতিদূরেই তাঁর সেই গুহা ও রাম মন্দির। এখনও আছে। সেখানে গোস্বামীজির ব্যবহৃত খড়ম ও কাঁথা সযত্নে রক্ষিত। ভক্তকবি তাঁর 'রামচরিতমানস' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ এখানে বসেই রচনা করেছেন। এটি বারাণসীর একটি পরমপবিত্র তীর্থ। তাই অগণিত পুণ্যার্থী প্রতিদিন এখানে এসে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে যান।

—আমরা দর্শন করব না? অঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—করবে বৈকি! তবে তার জন্য আরেকদিন গাড়ি করে আসতে হবে। আজ এখান থেকে শুধু প্রণাম করে নাও।

ওরা হাতজোড় করে প্রণাম জানায়। আর তারপরেই মাঝি বলে ওঠেন—ঐ দেখুন, অসিনদী এসে গঙ্গায় পড়েছে আর দুই নদীর সঙ্গমে অসিঘাট।

—ওটা নদী কোথায়? ও তো একটা নালা!

বাবলার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। হাসি থামলে আমি বলি—হ্যাঁ বাবা, এখন মজে গিয়ে নালার মতই হয়ে গেছে, আগে বেশ বড় নদী ছিল। অবশ্য বর্ষাকালে এখনও অনেক জল হয়। উত্তরের বরুণা থেকে দক্ষিণের এই অসি পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বারাণসী নগরী।

—অর্ধচন্দ্রাকার কি জেঠু? সঙ্গে সঙ্গে বাবলা জিজ্ঞেস করে।

মনে মনে লজ্জা পাই। সত্যই শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হয় নি। কিন্তু জবাবদিহি করার আগেই অপু আমাকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেয়। বলে—অর্ধচন্দ্রাকার মানে আধখানি চাঁদের মতো বাঁকা। কেদারঘাটে দাঁড়িয়ে দেখলি না, কাশীর গঙ্গাতীরটা কেমন ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো।

ফার্স্ট ব্র্যাকেট জিনিসটা জানা আছে বাবলার। সুতরাং সে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা, এই অসি সঙ্গম থেকে-বরুণা সঙ্গম হাঁটাপথে কতটা দূর? মনোরঞ্জন প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই—চার ক্রোশ, অর্থাৎ আট মাইল।

—এখন নিশ্চয়ই শহর অনেক বেড়ে গিয়েছে?

—তা বেড়েছে বৈকি। দক্ষিণের এই ভেলুপুরা অঞ্চল ছাড়িয়ে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। আর উত্তরে রাজঘাটের কিছুদূরে সারনাথ। রাজঘাট অঞ্চলকে বলে আদমপুরা। ভেলুপুরা ও আদমপুরার মাঝখানে গঙ্গাতীরের অংশকে বলে চক ও কোতয়ালী অঞ্চল।

—আমাদের হোটেল কি চক অঞ্চলে?

—হ্যাঁ। আমাদের উত্তরে কোতয়ালী আর পশ্চিমে চৈৎগঞ্জ। কোতয়ালীর পশ্চিমে জৈৎপুরা। চৈৎগঞ্জ আর জৈৎপুরার পরে রেললাইন। রেললাইনের পশ্চিমে বরুণার তীরে ক্যান্টনমেন্ট অর্থাৎ রেল স্টেশন অঞ্চল। এই অংশটিকে একটি পৃথক শহর বলা হয়।

—যাক্ গে। এবারে অসি ঘাটের কথা বলুন। অর্চনা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চায়।

—অসি ঘাট যে বাঁধানো নয়, তা তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছ। তবু দেখো, কাদা ভেঙ্গে কত মানুষ স্নান করছেন। এবং সকাল থেকে এই স্নান শুরু হয়েছে, চলবে সারাদিন, শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস। এটি কাশীর একটি অতি ব্যস্ত ঘাট। আগেই বলেছি কাশীর পঞ্চতীর্থ পরিক্রমার প্রথম তীর্থ অসিঘাট। যাত্রীরা এই ঘাটে স্নান ও তর্পণ করে ওপরের মন্দিরে যান। সেখানে অসিসঙ্গমেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করেন। তারপরে শুরু হয় যাত্রা। গঙ্গাতীরের পথ ধরে একটির পরে একটি মন্দির ও ঘাট দর্শন করে বাবা বিশ্বনাথের জয়গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেন দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। তোমাদের বলেছি দশাশ্বমেধ হল পঞ্চতীর্থের দ্বিতীয় তীর্থ।

ওরা মাথা নাড়ে। একটু থেমে আবার বলি—পঞ্চতীর্থ যাত্রীরা যেখান থেকে

যাত্রা শুরু করেন, সেখানে এসেই এবেলার মতো [illegible]লযাত্রা হল শেষ।

মাঝি নৌকো ফেরান। নৌকো এগিয়ে চলে দশাশ্বমেধের দিকে। ঘড়ি দেখি, বেলা সওয়া বারোটা। তার মানে অসি ঘাটে আসতে আমাদের দু ঘন্টার ওপরে লেগেছে। তাই তো লাগবেই। একে দেখতে দেখতে এসেছি, তার ওপরে স্রোতের বিপরীতে। এবারে দেখা নেই এবং স্রোতের সঙ্গে চলব। আশা করছি একটার মধ্যে দশাশ্বমেধ পৌঁছে যাবো।

—ও জেঠু! চুপ করে রইলে কেন?

বাবলির কথায় আমার ভাবনা থেমে যায় জিজ্ঞেস কবি—কি বলব?

—গল্প।

—গল্প! কার গল্প?

—মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের।

হায় হরি! আমি ভুলে গেলে কি হবে? ছোট্ট সঙ্গীরা ভুলে যায় নি আমার প্রতিশ্রুতি। অতএব শুরু করতে হয়—

অযোধ্যার রাজা ত্রিশঙ্কু। তাঁব ছেলে হরিশ্চন্দ্র বড় হয়ে গিয়েছেন, বিয়ে করেছেন। রাজার আর রাজকার্যে মন নেই। একদিন তিনি পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে সংসারজীবন থেকে ছুটি নিলেন। আর তারপবেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বরে দিব্য শরীর ধারণ কবে স্বর্গলাভ করলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় দানশীল ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর সুশাসনে প্রজাগণ সুখ ও শান্তিতে দিন কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাজার জীবনে সুখ নেই। মনে শান্তি নেই। কারণ স্ত্রী শৈব্যা সন্তানহীনা। রাণীব কোন ছেলে-মেয়ে হয় নি।

অবশেষে রাজা জলদেবতা বরুণের শরণ নিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বরুণ বললেন—আমি তোমাকে একটি পুত্র দান কবতে পাবি। কিন্তু সেই ছেলে একটু বড হবার পরেই তোমাকে আমার পুজোব আযোজন কবে সেই পুজোবেদিতে ছেলেটিকে বলি দিতে হবে।

কাজটা কঠিন জেনেও রাজা সম্মত হলেন। ভাবলেন—তবু তো ছেলের মুখ দেখতে পাবো।

যথাসময়ে শৈব্যার একটি ভারী সুন্দর ছেলে হল। হরিশ্চন্দ্র ছেলের নাম রাখলেন রোহিতাশ্ব।

রাজা বেশিদিন পুত্রসুখ সইতে পারলেন না। বরুণদেব এসে হাজির হলেন। বললেন—এবারে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো।

রাজা সবিনয়ে কিছু সময় প্রার্থনা করলেন। বরুণ সময় দিয়ে চলে গেলেন।

যথাসময়ে বরুণদেব আবার হরিশ্চন্দ্রের কাছে এলেন। রাজা আবার সময় প্রার্থনা করলেন। এইভাবে কয়েকবার ফিরে যাবার পরে বরুণদেব আর সময় দিতে চাইলেন না। তবু রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। ক্রুদ্ধ বরুণদেব রাজাকে অভিশাপ দিলেন। রাজা দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকলেন।

রাজার কষ্ট দেখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দয়া হল। তাঁর পরামর্শমতো জপ-তপ করে তিনি শেষ পর্যন্ত বরুণের শাপমুক্ত হলেন।

শাপমুক্ত হবার পরে আনন্দিত রাজা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তখন তাঁর আর বিশ্বামিত্রের কথা মনে পড়ল না। তিনি বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের হোতারূপে বরণ করলেন। যজ্ঞশেষে বশিষ্ঠকে বিপুল ধনসম্পত্তি দান করলেন।

কথাটা বিশ্বামিত্রের কানে এলো। অকৃতজ্ঞ রাজার আচরণে তিনি খুবই রেগে গেলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন—আমি হরিশ্চন্দ্রকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করব।

কিছুদিন পরে রাজা মৃগয়ায় গেলেন। সুযোগ বুঝে বিশ্বামিত্র যোগবলে মায়া বিস্তার করলেন। রাজা পথ হারিয়ে বনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। পথভ্রষ্ট রাজা আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পথ দেখিয়ে অযোধ্যায় নিয়ে চলুন। আপনি যা চাইবেন, আমি আপনাকে তা-ই দেব।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন মায়াবলে এক কুমার ও একটি কুমারীকে সৃষ্টি করে বললেন—আমি এদের বিয়ে দিতে চাই। তুমি এই বিয়ের সব খরচ দেবে।

রাজা সম্মত হলেন। ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বামিত্র তখন পথ দেখিয়ে রাজাকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন।

কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণ আবার রাজার কাছে এলেন। বললেন—রাজা সেই কুমার-কুমারীর বিয়ে হবে। আপনি এখন আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

রাজা সবিনয়ে বললেন—নিশ্চয়ই করব। অনুগ্রহ করে বলুন, আমাকে কি দিতে হবে?

—আপনি আমাকে চামরাদিসহ রাজছত্র, সমস্ত হাতি ঘোড়া রথ ও সৈন্য সহ রাজভাণ্ডার এবং সারা রাজ্য দান করুন।

মুনির মায়ায় মুগ্ধ রাজা সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকে সবকিছু দিয়ে দিলেন।

কিন্তু বিশ্বামিত্রের বাসনা তাতেও পূর্ণ হল না। তিনি তখন রাজাকে বললেন—দক্ষিণা ছাড়া কোন দান পূর্ণ হয় না। এবারে আপনি আমাকে সুর্বণ-দক্ষিণা দিন।

মায়ামুগ্ধ রাজার সম্বিত ফিরে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর যে নিজের বলতে আর কিছুই নেই। এখন তিনি দক্ষিণা দেবেন কেমন করে?

রাজা কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। তবু ব্রাহ্মণকে বললেন—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে একটা দিন সময় দিন। আগামীকাল সন্ধ্যায় একবার আসুন, আমি অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে দেব।

ব্রাহ্মণ চলে যাবার পরে রাজা অনেক ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল, দিন ফুরিয়ে এলো কিন্তু রাজা কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। এসেই বললেন—আপনি আজই প্রাসাদ ছেড়ে দিন। রাজ্য ছেড়ে চলে যান। যাবার আগে আমার দক্ষিণা দিন। আপনার সত্য রক্ষা করুন।

রাণী শৈব্যা ও রাজপুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে রাজা অযোধ্যা ত্যাগ করলেন। কিন্তু দক্ষিণা দিতে পারলেন না। বিদায়বেলায় সবিনয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন—আপনি আমাকে একমাস সময় দান করুন। এর মধ্যে আমি আপনার দক্ষিণা যোগাড় করে দেব।

সপরিবারে হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যা থেকে কাশী চলে এলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও দক্ষিণার সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে পারলেন না। এদিকে সময় ফুরিয়ে এলো। বাধ্য হয়ে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও রোহিতকে বিক্রি করে কিছু সোনার মোহর যোগাড় করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে মোহরগুলি তাঁর পায়ের ওপরে রাখলেন।

কিন্তু মুনির মন ভরল না। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—এই কটা মোহর! না, না, এ আমার উপযুক্ত দক্ষিণা নয়। আপনি আরও মোহর দিন এবং তা আজকের মধ্যেই। আমি সন্ধ্যাব সময় আবার আসব।

স্ত্রী ও পুত্রের বিরহে কাতর নিরুপায় রাজা তখন বাজারে গিয়ে নিজেকে বিক্রি করতে চাইলেন।

স্বয়ং ধর্মরাজ প্রবীর নামে এক চণ্ডালের রূপ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে কিনে নিলেন। আত্মবিক্রয় করে রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে সমর্থ হলেন।

প্রবীর তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দক্ষিণ-বারাণসীর এই মহাশ্মশানে নিয়ে এসে চণ্ডালের কাজে নিযুক্ত করলেন। রাজা শবদাহ শুরু করে দিলেন।

কিছুকাল পরে একদিন সাপের কামড়ে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হল। পতিবিরহে কাতর ক্রীতদাসী শৈব্যা গভীর রাতে মৃত পুত্রকে কাঁধে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানের পথে এগিয়ে চললেন।

সন্তানহারা মায়ের আকুল আর্তনাদ শুনে নগরপাল পথে ছুটে এলেন। শৈব্যাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? এ কার ছেলে? তোমার স্বামীর নাম কি?

শৈব্যা তখন পুত্রশোকে প্রায় পাগলের মতো চিৎকার করছেন। নগরপালের কোন কথাই তাঁর কানে ঢুকল না। প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে তিনি টলতে টলতে এগিয়ে চললেন।

নগরপাল ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই কোন মায়াবিনী, বালকঘাতিনী রাক্ষসী। তিনি তাঁকে বন্দী করে প্রবীর চণ্ডালেব কাছে নিয়ে এলেন। বললেন—এ একজন দুষ্টা স্ত্রীলোক। এর কোন বিচারের দরকাব নেই। তুমি এই মুহূর্তে একে বধ করো।

শৈব্যা তখন কাঁদতে কাঁদতে জানালেন—আমি দুষ্টা নই। আমি এক দুঃখিনী মা। তোমরা আমাকে মেরো না। দয়া কবে আমার মৃত পুত্রের সৎকারের ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর কেনই বা শুনবে? রাজা হরিশ্চন্দ্রও যে রাণী শৈব্যাকে চিনতে পারলেন না।

প্রবীর তখন হরিশ্চন্দ্রের হাতে খড়্গ তুলে দিয়ে বললেন—এই নষ্ট চরিত্রাকে বলি দাও।

খড়্গ হাতে নিয়ে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার সামনে গিয়ে বললেন—মৃতদেহটা পাশে রেখে তুমি মাথা নিচু করে বসে পড়ো, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

পুত্রকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে রাণী উঠে দাঁড়ালেন। মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—চণ্ডাল, তুমি আমাকে বধ করো। তাতে আমার ভালই হবে। আমি জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে সর্পাঘাতে

মৃত আমার এই একমাত্র পুত্রের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করতে হবে।

এইবারে রাজা রাণীকে চিনতে পারলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মৃতদেহের সামনে বসে পড়ে মুখের কাপড় সরিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা পুত্রশোকে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকলেন।

নগরপাল বিস্মিত। প্রবীররূপী ধর্মরাজের চোখ দুটিও জলে ভিজে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে রাজা জ্ঞান হারালেন। রাণীও মৃত পুত্রের ওপরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে তাঁদের জ্ঞান ফিরে এলো। আরও কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পরে দুজনে স্থির করলেন, রোহিতাশ্বের এই অকাল মৃত্যুর পরে তাঁদের আর জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরাও ছেলের চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন।

হরিশ্চন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কাঠ এনে চিতা সাজালেন। চিতার ওপরে সযত্নে প্রিয়পুত্র রোহিতাশ্বের শব স্থাপন করলেন। গঙ্গাজল এনে রোহিতকে স্নান করিয়ে তার সারা শরীরে আতর ও চন্দন ছড়িয়ে দিলেন। অবশেষে পিতা পুত্রের মুখাগ্নি করলেন। চিতায় আগুন দিয়ে সস্ত্রীক চিতার ওপরে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁরা ধ্যানস্থ হলেন।

না। আগুন দেবার পরেও রোহিতাশ্বের চিতা জ্বলল না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা বরুণ জল ঢেলে সে চিতার আগুন নিভিয়ে দিলেন। তারপরেই মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেখানে এলেন। এলেন বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্র, এলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ধর্মরাজ তাড়াতাড়ি প্রবীরের রূপ ত্যাগ করে সশরীরে তাঁদেব পাশে এসে দাঁড়ালেন।

রাজা ও রাণী চিতা থেকে নেমে এসে তাঁদের প্রণাম করলেন। স্নিগ্ধস্বরে বিষ্ণু রাজাকে বললেন—তোমার দানশীলতায় বিশ্বামিত্রসহ আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি। তাই বিশ্বামিত্র এখানে এসেছেন। তিনি এখুনি তোমার দান ফিরিয়ে দিতে চান।

—কিন্তু রাজ্য আর রাজকোষ দিয়ে আমি কি করব ভগবান? আমরা এসব কিছুই চাই না, আপনারা শুধু আমাদের ছেলেকে ফিরিয়ে দিন।

—তোমরা তাও পাবে। দেবরাজ ইন্দ্র বলে উঠলেন। তিনি অমৃত বর্ষণ করে রোহিতাশ্বকে বাঁচিয়ে তুললেন।

আর রোহিতাশ্ব ভাবলেন, তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। বহুদিন বাদে বাবাকে কাছে পেয়ে ছেলে তাঁর কোলে মুখ লুকোলেন। শৈব্যার দু গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা—আনন্দাশ্রু।

স্বর্গ থেকে অন্যান্য দেব-দেবীরা পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন। স্ত্রী ও পুত্রকে পেয়ে রাজা আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

ইন্দ্র বললেন—মহারাজ, তুমি আপন কর্মফলে সস্ত্রীক সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করে পরমসম্পত্তি লাভ ক'রো।

—কিন্তু দেবরাজ, আমি যে আমার প্রভু প্রবীর চণ্ডালের অনুমতি না পেলে এই শ্মশানভূমি পরিত্যাগ করতে পারব না। তিনি এখানেই ছিলেন। অথচ এখন তো দেখতে পাচ্ছি না তাঁকে!

একটু হেসে ধর্মরাজ বললেন—কেমন করে দেখবে? আমিই যে প্রবীরের রূপ

নিয়ে তোমাকে কিনে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য, আমিই সাপ হয়ে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছিলাম। এখন তোমার ধর্মনিষ্ঠা ও দানশীলতায় আমরা মুগ্ধ। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

রাজা তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও দেবতাদের স্বাক্ষী রেখে রোহিতাশ্বকে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। স্বর্গ থেকে আবার পুষ্পবৃষ্টি হল। আর তারই মাঝে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র দেবদুর্লভ দিব্যরথে আরোহণ করে সস্ত্রীক সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।

।। দশ ।।

বেলা একটায় হোটেলে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে বিকেল তিনটের মধ্যে আবার ঘাটে ফিরে আসা, আমার সহযাত্রীদের পক্ষে কোনমতেই সহজ কাজ নয়। অথচ তারা সত্যি সত্যি সেই কঠিন কাজটাই করে ফেলল।

আমি কিন্তু আশা করতে পারি নি। কারণ ওরা তো পর্যটক নয়, বেড়াতে এসেছে। সারা বছর ঘরে-বাইরে কাজ করে কয়েকদিনের জন্য একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। এ অবস্থায় ওদের পক্ষে এমন সময় মেনে ভ্রমণ করা সত্যই অবাক হবার মতো।

যাক্ গে, মনে মনে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে নৌকোয় উঠে এসেছি। বলা বাহুল্য দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরাংশ সেই প্রয়াগ ঘাট থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে।

এ বেলা দশাশ্বমেধের দিকে না গিয়ে উত্তরে অর্থাৎ মালব্য পুলের দিকে চলেছি। ঐ পুল পেরিয়েই কাশীতে আসা-যাওয়া। সত্যজিৎবাবু ঐ পুলের 'ব্রিজ-গার্ডার' দেখিয়েই তাঁর 'অপরাজিত' ছবি আরম্ভ করেছেন। তাহলেও মালব্য পুলের কথা এখন নয়। কারণ সে পুল এখনও বহুদূরে। তার আগে আমাদের অনেক দর্শন।

ঠিক কথা, সকালে একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি। দশাশ্বমেধ ঘাটের একাংশের নাম যেমন প্রয়াগ ঘাট, তেমনি আরেক অংশকে বলে পাথর ঘাট। আক্ষরিক অর্থেই তাই। কারণ সেই সুদূর অতীত থেকে বারাণসীতে বাড়ি-ঘর তৈরির জন্য গঙ্গাপথে চুনার থেকে পাথর এনে এই ঘাটে নামানো হয়েছে।

মাঝির কথা শুনে তাঁর দিকে তাকাতে হয়। তিনি বলছেন—বাঁদিকে দেখুন, মানমন্দির ঘাট।

—মানমন্দির মানে কি জেঠু? সঙ্গে সঙ্গে বাবলা জিজ্ঞেস করে।

—মান মানে মাপা বা লক্ষ্য করা। মানমন্দিরের ইংরেজী হচ্ছে অব্‌জারভেটারী। যেখান থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়, মহাকাশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়।

—এখানে তেমনি মানমন্দির আছে বুঝি? বাবু জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। জয়পুরের মহারাজা সোয়াই জয়সিংহ অষ্টাদশ শতকে ভারতের পাঁচ শহরে পাঁচটি মানমন্দির তৈরি করান, এটি তারই একটি।

—অন্য চারটি কোথায়? বাবলি জিজ্ঞেস করে।

—মথুরা, জয়পুর, উজ্জয়িনী ও দিল্লীতে।

—দিল্লীরটা তো তুই দেখেছিস! ধীরেন মেয়েকে বলে—যন্তর-মন্তর দেখিস নি?

—দেখেছি। আমিও দেখেছি, গতবার। বাবলা বলে ওঠে।

বাবলি মাথা নাড়ে। অপু জিজ্ঞেস করে—মহারাজা সোয়াই জয়সিংহের সময়টা?

—তিনি ১৬৯৯ সালে অম্বরের সিংহাসনে বসেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। রাজনীতি, ইতিহাস, তন্ত্রশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিদ্যাধর চক্রবর্তী নামে জনৈক বাঙালী ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনায় জয়সিংহ জয়পুর মহানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুর পৃথিবীর প্রথম পরিকল্পিত নগরী।*

তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ)। তিনি মহারাজা জয়সিংহের জ্যোর্তিবিদ্যার পরিচয় পেয়ে তাঁর ওপরেই দেশের পঞ্জিকা সংশোধনের ভার দিলেন। সেই কাজ করার জন্যই মহারাজা মথুরা জয়পুর উজ্জয়িনী দিল্লী ও বারাণসীতে মানমন্দির স্থাপন করেন। তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বিভিন্ন আর্য-যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি মান অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের গতির পরিমাণ স্থির করে পঞ্জিকা সংশোধন করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের কথা মহারাজা জয়সিংহের মৃত্যুর পরে এই সব মানমন্দিরে বিশেষ করে বারাণসীতে জ্যোতিষচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই শতকের মাঝামাঝি বারাণসীর মানমন্দিরটির সংস্কার ও উন্নয়নের একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। এখন এখানে কোন উপযুক্ত জ্যোতির্বিদ নেই, মেধাবী ছাত্ররাও আর এখানে আসে না। ফলে যন্ত্রগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পর্যন্ত হয় না।

—তার মানে মানমন্দিরে কোন লোকজন নেই? সুধাংশু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই—আছেন। জয়পুরের কয়েকজন রাজকর্মচারী। তাঁরা কেউ জ্যোর্তিবিদ নন। তাঁরা তীর্থযাত্রীদের যন্ত্রগুলো দেখিয়ে কিছু গল্প বলেন আর সরল মানুষগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করেন।

আরেকটা কথা, কেবল মান-যন্ত্রগুলো নয়, মানমন্দিরের বাড়িটির স্থাপত্যকলাও দেখবার মতো। অবস্থানও চমৎকার, গঙ্গাতীরে। যন্ত্রগুলো সব রয়েছে ছাদের ওপর। তোমরা একদিন গিয়ে দেখে এসো।

আমি মানমন্দিরের প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। কিন্তু পেরে উঠি না। অপু প্রশ্ন করে বসে—জেঠু! তুমি যন্ত্রগুলো দেখেছো?

—হ্যাঁ। একবার নয়, কয়েকবার।

—তাহলে একটু ব'লো না তাদের কথা।

হেসে বলি—আমি তো জ্যোর্তিবিদ নই, ঠিকমত বলতে পারব না। তবে যা দেখেছি আর শুনেছি, তাই সংক্ষেপে বলছি।

অপু মাথা নাড়ে, আমি বলতে থাকি—সব মিলিয়ে গুটিআটেক যন্ত্র আছে এই মানমন্দিরে। দুটি যন্ত্রের নাম দক্ষিণোত্তর ভিত্তিযন্ত্র, দুটি সম্রাটযন্ত্র, একটি উত্তর ও একটি দক্ষিণ গোলযন্ত্র, একটি চক্রযন্ত্র ও একটি দিগংশযন্ত্র।

—এগুলো দিয়ে কি কি কাজ করা হত?

—প্রথম দুটি যন্ত্র দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যাহ্ন বৃত্তের জ্ঞান ও তাদের উন্নত-অনুন্নত অবস্থার সময় জানা যায়। সম্রাট-যন্ত্রদুটি খুবই উচ্চমানের সূর্যঘড়ি। গোল-যন্ত্রদুটি দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রহ-নক্ষত্রের সময় ও নতকাল নির্ণয় করা যায়। চক্রযন্ত্রে ক্রান্তি বিষয় ও দিগংশযন্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানা যায়।

ইতিমধ্যে নৌকো অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছে। আমরা মীরঘাট ছাড়িয়ে

* লেখকের রাজভূমি রাজস্থান দ্রষ্টব্য।

এসেছি। বারাণসীর গোড়া ব্রাহ্মণগণ এই ঘাটের ওপরে একটি নতুন বিশ্বনাথ মন্দির নির্মাণ করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেওয়ায় বিশ্বনাথ মন্দির তাঁর পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। বলা বাহুল্য তাদের এই সঙ্কীর্ণতা বিশ্বনাথ মন্দিরের জনপ্রিয়তা কমাতে পারে নি বরং তাঁরা নিজেরাই একঘরে হয়ে গিয়েছেন।

মীরঘাটের পরেই ললিতা ঘাট বা লহরি ঘাট। শুনেছি বহুবছর আগে পাঞ্জাবের লাহোর থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রীপরিবার গঙ্গাপথে বারাণসী এসে এইঘাটে নৌকো নোঙর করেন এবং এই অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। তাই স্থানীয়রা একে লহরিঘাট বলতে শুরু করেন। সে নামটি আজও মুছে যায় নি।

—এখানে কি ললিতাদেবীর কোন মন্দির আছে? টুকু জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—আছে। মন্দিরে ললিতাদেবীর বিগ্রহ। সে বিগ্রহ পরিক্রমা করলে নাকি বিশ্ব-পরিক্রমার ফললাভ করা যায়। আর আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় কোন কামনা করে এই ঘাটে দেবীপূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

—অন্য কোন মন্দির নেই এখানে? এবারে অর্চনা প্রশ্ন করে।

—আছে। নেপালী শিল্পকলায় নির্মিত ভারী সুন্দর শিবমন্দির। লিঙ্গমূর্তির নাম পশুপতেশ্বর। মন্দিরটি দেখবার মতো। যেমন গড়ন, তেমনি কারুকার্য। বিশেষ করে কাঠের ওপরে খোদাইকাজ।

মন্দিরের চূড়ায় কয়েকটি ঘণ্টা বাঁধা আছে। গঙ্গার হাওয়ায় দুলে দুলে সেগুলো দিন-রাত অপরূপ সুরসৃষ্টি করে চলেছে। আর সেই সুরের মূর্ছনায় সৃষ্ট হচ্ছে স্বর্গীয় পরিবেশ। নেপালের জনৈকা মহারাণী মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। কাশীতে এতো সুন্দর মন্দির খুব কমই আছে।

একটু থেমে আবার বলি—শিবতীর্থ কাশীতে অবস্থিত হয়েও ললিতাঘাট কিন্তু বিষ্ণুতীর্থ। আর তাই এ ঘাটের ইষ্টদেবতার নাম গঙ্গাকেশব।

ললিতাঘাট ছাড়িয়ে আসার পরেই ধোঁয়া নজরে এলো। সামনে বাঁদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালো ধোঁয়া। মাঝি বলে ওঠেন—মহাশ্মশান মণিকর্ণিকা। দর্শন করুন।

তাড়াতাড়ি তাকাই। ভাল করে দেখি। হ্যাঁ, চিতা জ্বলছে। একটি নয়, দুটি নয়, কয়েকটি। এটাই এখন কাশীর প্রধান শ্মশান। মোক্ষক্ষেত্র বারাণসী ধামের স্বর্গতোরণ। এখানেও চিতার আগুন কখনও নেভে না।

মাঝি আবার বলেন—আপনারা শুনেছেন, অসিঘাট থেকে রাজঘাট চারক্রোশ, মনিকর্ণিকা ঠিক তার অর্ধেক পথ, দুই ক্রোশ।

আমাদের নৌকো শ্মশানের সামনে এসেছে, চিতাগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখি আর ভাবি, আমিও তো একদিন এমনি পঞ্চভূতে মিশে যাবো। লোভ-মোহ কামনা-বাসনা চাওয়া-পাওয়ার অবসান এই শ্মশানে, পাপ পুণ্য, ধনী নির্ধন, সুন্দর ও কুৎসিতের শেষ পরিণতি এই শ্মশান।

—শঙ্কুদা! কি ভাবছেন? জীবন আর মৃত্যুর কথা?

মনোরঞ্জনের প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কোনমতে বলি—শ্মশানের সামনে এলে তো কিছু শ্মশান-বৈরাগ্য হবেই। তাহলেও আমি সেকথা তোমাদের বলব না। বলব অন্য কিছু।

—কি?

—আজকাল সবাই এ শ্মশানকে বলেন মণিকর্ণিকা। কিন্তু মণিকর্ণিকা শ্মশান নয়, মণিকর্ণিকা চক্রতীর্থ ও চরণ-পাদুকাপীঠ। মণিকর্ণিকা তীর্থের গল্প গতকাল সন্ধ্যায় আমি অপুদের বলেছি।

হ্যাঁ, তোমরা আমাদের কাছ থেকে শুনে নিও।

বাবলার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে।

আমি বলি—এখন শ্মশানের কথা বলছি। এর প্রকৃত নাম রাজবল্লভ শ্মশানঘাট। রাজা রাজবল্লভ এই ঘাটের মালিক ছিলেন। তাঁর নামেই ছিল এই ঘাটের নাম। এটিও কাশীর একটি সাধারণ স্নানের ঘাট ছিল। আর তখন কাশীতে একটাই শ্মশান? হরিশ্চন্দ্র।

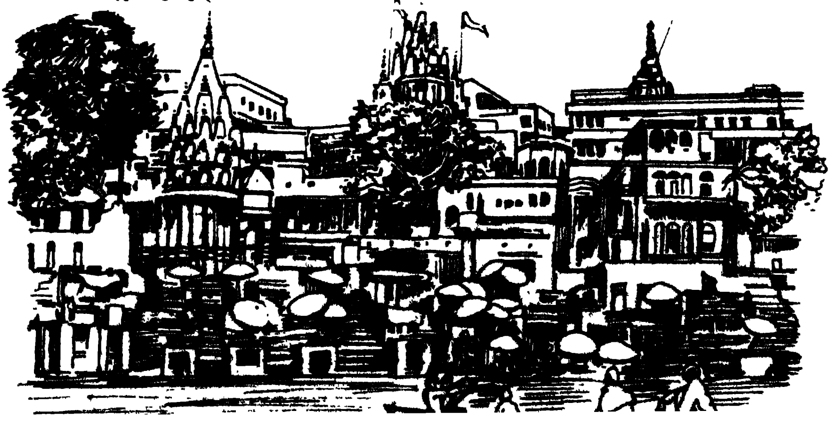
এখানে প্রথম শবদাহ করা হয় ১৭৬০ সালে। এবং তা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানের লোভী চণ্ডালদের অত্যাচারের প্রতিবাদে। তখন অযোধ্যার নবাব ছিলেন সফদর জঙ্গ বাহাদুর। কাশ্মীরীমল নামে জনৈক ক্ষত্রীয় ছিলেন তাঁর তোষাখানার রক্ষক। ঐ বছর কাশ্মীরীমলের মা মারা যান। সৎকারের জন্য তিনি মায়ের শবদেহ হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে নিয়ে আসেন। শ্মশানের চণ্ডাল শ্মশানকর বাবদ বহু টাকা দাবী করেন। কাশ্মীরীমল সে টাকা অনায়াসে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চণ্ডালের জুলুম মেনে নিতে পারলেন না। তারপরে তিনি যখন শুনলেন যে চণ্ডাল গরীবদের ওপরেও এমনি জুলুম করেন, তখন তিনি খুবই রেগে গেলেন। মায়ের মৃতদেহ নিয়ে এলেন এই রাজবল্লভ ঘাটে। মনে মনে স্থির কবলেন, এখানে আরেকটি শ্মশান প্রতিষ্ঠা করে কাশীবাসীদের চণ্ডালেব অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন।

মাকে গঙ্গাতীরে রেখে তিনি রাজা রাজবল্লভের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে বললেন—আমি আপনাকে সাধ্যমত দাম দেব, আপনি ঘাটটি আমার কাছে বিক্রি করুন। আমি কাশীতে আরেকটি শ্মশান প্রতিষ্ঠা করে চণ্ডালের অত্যাচার বন্ধ করতে চাই।

উদার প্রতিনিধি নিজের দায়িত্বে সামান্য দাম নিয়েই ঘাটটি তাঁকে লিখে দিলেন। মায়ের মৃতদেহ সৎকার করে কাশ্মীরীমল কাশীর নতুন শ্মশানের উদ্বোধন করলেন।

—তাহলে এ শ্মশানকে সবাই মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান বলে কেন? আমি থামতেই অঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—রাজবল্লভ ঘাটটি ছিল অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, তাই সবাই ঘাটটিব অবস্থান বোঝাবার জন্য—পাশের সুপরিচিত মণিকর্ণিকা ঘাটের উল্লেখ করতেন। আর তাবই ফলে এর নাম হয়ে গেছে মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান।



শ্মশান ছাড়িয়ে আমরা এখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সামনে এসেছি। অনেকখানি গঙ্গাতীর জুড়ে বেশ বড় বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপরে মন্দির কুণ্ড এবং বড়-বড় বাড়ি।

—এখানে নৌকো থামাবেন না?

—থামাবো। মাঝি উত্তর দেন। বলেন—এখন নয়, ফেরার পথে।

বাবলা বোধকরি প্রস্তাবটা মেনে নেয়। সে চুপ করে থাকে। গঙ্গার বুক বেয়ে নৌকো এগিয়ে চলে।

টুকু নীরবতা ভঙ্গ করে। আমার দিকে ফিরে বলে—মণিকর্ণিকা না হয় ফেরার পথে দর্শন করা যাবে, কিন্তু তাঁর তীর্থমাহাত্ম্য এখন শোনায় তো কোন বাধা নেই। বরং সেটি আগে শুনে নিলে দর্শনের সময় সুবিধে হবে।

কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই বাবলা বলে ওঠে—বললাম যে আমার কাছে পরে শুনে নিও!

আবার হাসি। হাসি থামলে মাঝি বলেন—এটা সিন্ধিয়া ঘাট।

আমরা ঘাটের দিকে তাকাই। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘাট তবে বড়ই ভাঙ্গাচোরা। অথচ ঘাটের ওপরে বড়-বড় মন্দির আর বাড়ি।

সুধাংশু বলে—ঘাটটার এমন দশা কেন?

—তীর্থদেবতার রোষে।

—কি রকম?

—তখন গোয়ালিয়বের রাণী ছিলেন বৈজাবাঈ। মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এই ঘাট বাঁধাতে শুরু করিয়েছিলেন। কাজ আরম্ভ হবার পর থেকেই তাঁর মনে বড় গর্ব হল। মুখেও বলে বেড়াতে থাকলেন, এতদিনে মাতৃঋণ পরিশোধ করতে পারলাম।

তীর্থদেবতা ক্রুদ্ধ হলেন, এত অহঙ্কার! মাতৃঋণ পরিশোধ করবে!

ব্যাস! অকালে গঙ্গায় বাণ এলো। আর সেই প্রবল বন্যায় নির্মীয়মান ঘাটগুলো ভেঙ্গেচুরে চুরমার হয়ে গেল।

মহারাণী বুঝতে পারলেন, দেবতা তাঁর দম্ভের শাস্তি দিয়েছেন। অনুশোচনার আগুনে পুড়তে পুড়তে একদিন তাঁর জীবনের জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

—তারপরে আর কেউ এ ঘাট তৈরির চেষ্টা করেন নি?

—করেছেন। এবং সফলও হয়েছেন। বছর ষাটেক আগের কথা। জনৈক সন্ন্যাসী পথে পথে ভিক্ষে করে লাখখানেক টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তাই দিয়ে তিনি এ ঘাটটি নতুন করে বাঁধিয়ে দেন। কিন্তু সংস্কারের অভাবে সেটিও এখন ভেঙে গেছে। কারণ গঙ্গার এই অংশে বড্ড বেশি স্রোত।

সিন্ধিয়া ঘাট ছাড়িয়ে আসতেই মাঝি সামনের ঘাটটি দেখিয়ে বলেন—এটা সঙ্কটা ঘাট।

—এখান থেকে সঙ্কটা মন্দির নিশ্চয়ই খুব কাছে? অর্চনা জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—কাছে বৈকি। খুবই কাছে। কিন্তু এখন দর্শনের সুবিধে হবে না। পরে একদিন গাড়ি করে গিয়ে দর্শন করে আসবে।

—তাহলেও আপনি এখন এই ঘাট ও সঙ্কটাদেবীর কথা একটু বলুন না! টুকু অনুরোধ করে।

আমি বলতে থাকি—দেবী সঙ্কটা সকল সঙ্কট-বিনাশিনী। তিনি অতিশয় জাগ্রতাদেবী। তাই কাশী এসে তীর্থযাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁকে দর্শন করেন। স্থানীয়রা বিশেষ করে বারাণসীর গৃহিণীরা সংসারে কোন সঙ্কটের আশঙ্কা দেখলেই ছুটে যান সঙ্কটা মায়ের কাছে, তাঁর করুণা প্রার্থনা করেন। তবে কাশীখণ্ডে সঙ্কটা শব্দটি নেই, আছে বিকটা।

গহনাবাঈ নামে জনৈকা ভক্ত বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। বেশ বড় মন্দির।

মন্দিরে মা-সঙ্কটা, দেবী কাত্যায়নীর বিগ্রহ রয়েছেন। আর আছে আত্মবিশ্বেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুদ্ধেশ্বর ও বৃহস্পতিশ্বরের মন্দির।....

—সঙ্কটা মন্দির তো আমরা একদিন দর্শন করতে আসবই। কিন্তু তখন বোধকরি সঙ্কটা ঘাটে আসার সুযোগ হবে না। আপনি ঘাটটির কথা বলুন। মনোরঞ্জন কৌশলে নতুন ফরমাশ পেশ করে।

একটু হেসে বলি—নৌকো থেকে দেখতে পেলে না, কিন্তু সঙ্কটাঘাটে নৌকো নোঙর করলেই দেখতে পেতে, ঘাটের ওপরে প্রকাণ্ড একটি হনুমান মূর্তি আর তার পাশে শিবমন্দির।....না, আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে হনুমান মূর্তিটি সত্যই দেখার মতো।

অনন্তকালের গঙ্গা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবনধারা গঙ্গা, বারাণসীর প্রাণপ্রবাহ গঙ্গা বেয়ে নৌকো চলেছে এগিয়ে। আজকের দিনটা সত্যই ভারী আনন্দের দিন। আজ প্রায় সারাদিন ধরে আমি গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করছি। আমার জীবনেও যে গঙ্গার অবদান অসীম। তাঁরই করুণা-বিগলিত পুণ্যবারিতে আমার ক্ষুদ্রজীবন প্রতিনিয়ত সিঞ্চিত হয়ে চলেছে। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানাই আর প্রার্থনা করি—মাগো, আমার এই মরদেহ যেন তোমার তীরে পঞ্চভূতে মিশে যেতে পারে।.....

—গোয়ালিয়রের রাজবাড়ি। বানারসের গঙ্গাতীরে সবচেয়ে বড় দুটি বাড়ির একটি। মাঝি ইসারায় বাড়িটা দেখিয়ে দেন।

—আরেকটা কোথায়? বাবু বলে ওঠে।

—মুন্সিঘাটে। তোমরা সকালে দেখছো, দ্বারভাঙ্গার রাজবাড়ি। একটু থেমে মাঝি আবার বলেন—এই গোয়ালিয়র প্রাসাদের আরেক নাম গঙ্গামহল।

—কিন্তু ঘাটটার অবস্থা তো ভাল নয় কাকা! বাবলি জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। এদিকে গঙ্গায় স্রোত বড্ড বেশি, ঘাটগুলো নিয়মিত মেরামত করতে হয়। মেরামতীর অভাবে অনেকগুলো ঘাট প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। যেমন গণেশঘাট, যমঘাট ও ভোঁসলাঘাট।

মাঝি থামতেই আমি যোগ করি—ভোঁসলাঘাট ভেঙে গেলেও ১৭৯৫ সালে তৈরি ভোঁসলাদের বাড়িটা কিন্তু ঐ দেখো কেমন অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে একটি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির রয়েছে।

ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একটু বাদে আমি আবার বলি—আর এই যে যমঘাট দেখছ, এটা ভেঙে গেলেও ভাইফোঁটার দিন বহু ভাই-বোন এখানে স্নান করতে আসে। স্নানশেষে বাড়ি ফিরে বোন ভাইকে ফোঁটা দেয়। আর সেদিন এই যমঘাটে বেশ বড় মেলা বসে।

কয়েক মিনিট বাদে মাঝি বলেন—এটা অগ্নিশ্বর ঘাট। ভেঙে গিয়েছিল। কয়েকবছব আগে আবার তৈরি করা হয়েছে। আগের ঘাটটি পুনার পেশোয়ারা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

—আপনি কিছু বলবেন না দাদা! ধীরেন আমাকে বলে।

আমি বলি—মাঝি ঠিকই বলেছেন। তবে কাশীর এই অগ্নিতীর্থ পরম পুণ্যময় স্থান। এখানে একটি জৈনমন্দির আছে। অবশ্য ঘাট নতুনভাবে তৈরি করার কারণ অগ্নিশ্বর কিম্বা জৈনমন্দির নয়। কয়েক বছর আগে এই ঘাটের ওপরে সন্তোষী মায়ের মন্দির নির্মিত হয়েছে, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মা-সন্তোষীর মর্মর মূর্তি। মায়ের আশীর্বাদে এখন এখানে প্রচুর ভক্তসমাগম হচ্ছে, বিশেষ করে শুক্রবারে। মা-সন্তোষীর ভক্তদের দানে ঘাটটি তৈরি হয়েছে।

—এটা রামঘাট। বানারসের একটা নামকরা ঘাট। আমি থামতেই মাঝি বলে ওঠেন,।—এখানে রামমন্দির আছে। মন্দিরে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের মূর্তি। নেপালী ও গুজরাতীদের খুব প্রিয় মন্দির। চৈত্র মাসেব শুক্লা নবমীতে স্নানের ভিড় হয়।

—ঘাটটি কতদিনের পুরনো? অর্চনা প্রশ্ন করে।

মাঝি চুপ করে আছে। আমাকেই উত্তর দিতে হয়—প্রায় পৌনে তিনশ' বছর আগে জয়পুরের মহারাজা প্রথম এই ঘাটটি তৈরি করে দিয়েছিলেন।

—পাশের ঘাটটার নাম কি? সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

মাঝি বলেন—লক্ষ্মণওয়ালা।

—হতেই হবে। রামের পাশে যে লক্ষ্মণকে থাকতেই হবে।

ওপরদিকে ইসারা করে বলি—আধুনিক ডিজাইনের ঐ যে বড় বাড়িটা দেখছ, ওটা সঙ্গবেদ বিদ্যালয় হাসপাতাল, কাশীর একটি প্রধান সেবা প্রতিষ্ঠান।

—লক্ষ্মণওয়ালা ঘাটে কোন মন্দির নেই? টুকু জিজ্ঞেস করে।

—আছে বৈকি। সিন্ধিয়া রাজপরিবারের নির্মিত কারুকার্যময় লক্ষ্মণবালাজীর মন্দির। এই মন্দিরে পাথরের ওপরে খোদাইকাজ এতো সুন্দর যে জড়োয়ার গয়নার সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর তাই এ মন্দিরের আরেক নাম জড়াও মন্দির। কার্তিক মাসে এখানে মেলা বসে।

দেখছিলাম সবাই। অনেকক্ষণ ধরে, রামঘাটের আগের থেকেই। কিন্তু এতক্ষণ কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি বলে আমিও চুপ করেছিলাম। এবারে অপু প্রশ্ন করে বসে—ওটা কি কোন মসজিদ?

—হ্যাঁ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৈরি আলমগীর মসজিদ। কাশীর কয়েকশ' মন্দির ধ্বংস করার পরে সেইসব মন্দিরের পাথর দিয়ে গঙ্গার তীরে তিনি এই মসজিদ

তৈরি করিয়েছিলেন। ইচ্ছে করেই মসজিদের মিনার দুটি অস্বাভাবিক উঁচু করেছিলেন। যেন বহুদূর থেকে দেখা যায় এবং হিন্দুরা পরবর্তীকালেও এত উঁচু কোন মন্দির নির্মাণ না করতে পারেন। অর্থাৎ কাশীর সমস্ত মন্দির ছাড়িয়ে তাঁর এই মসজিদ মাথা উঁচু করে ইসলামের বিজয় ঘোষণা করবে।

কিন্তু মহাকাল বড়ই নির্মম। বহু বছর আগেই একটা মিনার সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। এখন কেবল আরেকটি মিনারের সামান্য খানিকটা অংশ কোনমতে রয়েছে দাঁড়িয়ে। তবে গম্বুজ দুটি ও ছোট-ছোট মিনারগুলিসহ সারা মসজিদটাই মোটামুটি অক্ষত। ফলে গঙ্গাতীরের আকাশপটে আজও তার খানিকটা প্রভুত্ব টিকে রয়েছে।

—তাহলে কাশীতেও রামঘাটের পাশে মসজিদ? ধীরেন মন্তব্য করে।

—হ্যাঁ। তবে দুয়ের মাঝে কোন বিবাদ নেই। বরং চারিদিকে মন্দির পরিবৃত মসজিদটি ভারতে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

—এটা পঞ্চগঙ্গা ঘাট। মাঝি দেখিয়ে দেন। সেই ঘাটকে বাঁয়ে রেখে আমাদের নৌকো চলেছে এগিয়ে।



—কিন্তু পঞ্চগঙ্গা মানে তো পাঁচটি গঙ্গা, নিদেনপক্ষে নদী! অথচ আমরা তো একটাই গঙ্গা দেখতে পাচ্ছি। মনোরঞ্জনের স্বরে রসিকতার আমেজ।

অতএব পঞ্চগঙ্গার মান বাঁচাতে মুখ খুলতে হয়। বলি—পঞ্চগঙ্গা মানে পাঁচটি ধারার সঙ্গম। একদা ধূতপাপা যমুনা কিরণা ও সরস্বতী নামে চারটি উপনদী এখানে গঙ্গায় মিলিত হত। শহর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে ঘাটগুলি বাঁধিয়ে ফেলার জন্য, সেই চারটি ধারাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কেবল পঞ্চগঙ্গা নামটি রয়েছে বেঁচে। শুধু তাই নয়, এই পঞ্চগঙ্গা ঘাট পঞ্চতীর্থের চতুর্থ তীর্থ ও কাশীর একটি সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ঘাট।

সেকালে এই ঘাটের ওপরেই ছিল বিন্দুমাধব মন্দির, কাশীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ

দেবালয়। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মাঝে পরধর্মদ্বেষীরা প্রতি শতাব্দীতেই সেই মন্দির ধ্বংস করেছেন। কিন্তু প্রতিবার ধ্বংস করার পরে আবার নতুন মন্দির তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান মন্দিরেও একটি অনেক উঁচু ধ্বজা ছিল। সবাই বলতেন 'বেণীমাধবের ধ্বজা'। সেই ধ্বজার ওপরে ওঠা যেত। আর সেখান থেকে সারা কাশী শহরসহ সারনাথ পর্যন্ত দেখা যেত। বছর পঁচাত্তর আগে ধ্বজাটি ভেঙে পড়েছে।

সবচেয়ে বড় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মহারাজা মানসিংহ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ভারতভ্রমণে এসে প্রখ্যাত ফরাসী পর্যটক তাভের্নিয়ের (১৬০৫-১৬৮৯ খ্রীঃ) সেই মন্দির দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণে মন্দিরটিকে 'Great Pagoda' বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, মন্দিরে মানুষসমান উঁচু বিগ্রহ ছিল। আর তাঁর গায়ে ছিল সোনা ও মণি-মুক্তোর অলঙ্কার।

মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীও তাঁর রামচরিতমানসে ঐ মন্দিবের জয়গান গেয়েছেন। বলা বাহুল্য আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা সে মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করেন।

—তাদের পুলিসে ধরে নি?

বাবলার প্রশ্ন শুনে সবাই হেসে ফেলি। হাসি থামলে ধীরেন ছেলেকে বলে—পুলিশরাই যে লুঠপাট করেছে!

—যাঃ! পুলিশ আবার কখনও লুঠ করে নাকি? পুলিশ তো চোর-ডাকাতদের ধরে জেলে নিয়ে যায়।

ধীরেন কোন প্রতিবাদ করে না, চুপ করে থাকে। বোধকরি ভাবে, সরল বালক আরও কিছুদিন তার আপন বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখুক।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বলি—আরও দুটি কারণে পঞ্চগঙ্গা ঘাটটি বারাণসীর ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

—কি?

—পঞ্চদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ভক্তকবি কাশীতে বাস করতেন। তিনি এই ঘাটে বসে 'গঙ্গালহরী' নামে অপরূপ গীতিগুচ্ছ রচনা করেছেন। হিন্দু সমাজের সকল অনুশাসন উপেক্ষা করে সেই ব্রাহ্মণ একটি মুসলমান মেয়েকে ভালোবাসতেন। মেয়েটিও মৌলবাদীদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এই ঘাটে এসে তাঁর দয়িতের পাশে বসে তাঁকে প্রেরণা যোগাতেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের মহাতীর্থ হয়ে রয়েছে এই পঞ্চগঙ্গা ঘাট।

—আরেকটা কারণ? সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

—সেটা আরও বেশী স্মরণীয়।

—বেশ বলুন।

আমি শুরু করি—মানবধর্মের মহাসাধক ও ভক্তিগীতিকার কবীর এই ঘাটে বসে গুরু রামানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন।

আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর এক মুসলমান তাঁতী পরিবারে কবীরের জন্ম। বড় হয়ে তিনি পারিবারিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁত বুনতেন, বিয়েও

করেছিলেন যথাসময়ে। তাঁর স্ত্রীর নাম লোঈ। সাধারণ তাঁতীর মতো তাঁত বুনে সংসার চালাতেন কবীর। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর।

শৈশব থেকেই কবীরের মনে ধর্মবোধ জন্ম নিয়েছিল, যে ধর্মের মূলকথা মানুষ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তিনি মানবধর্মের পূজারী ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ছিল না।

কিন্তু কবীর কোন সমাজেই তাঁর সমর্থক পাচ্ছিলেন না। তিনি জানতেন তাঁর আদর্শের মৃত্যু নেই। তাই মানুষ তাঁর আদর্শ গ্রহণ করছেন না বলে তিনি বড়ই মনমরা হয়ে পড়লেন। কি করবেন ঠিক না করতে পেরে তিনি একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে এই ঘাটে এসে বসলেন। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আপনার ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একজন বৃদ্ধ স্নানার্থী ঘাটে নামবার সময় তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁর গায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—রাম রাম!

কবীর তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে উঠিয়ে বসালেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ আবার বললেন—রাম রাম!

কবীর তাঁর পা-দুখানি জড়িয়ে ধরলেন। সকরুণ স্বরে প্রার্থনা জানালেন—প্রভু! আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন।

রাজনীতির কূটচালে যে রামনাম আজ সাম্প্রদায়িকতার জিগিরে পর্যবসিত, সেই রামনামে মুসলমান কবীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহামন্ত্র খুঁজে পেলেন। কারণ তিনি জানতেন, রাম কোন বিশেষ ধর্মের কেবল একজন রাজা নন, তিনি জগতের সর্বোত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক, তিনি মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর কেউ নন, তৎকালীন বারাণসীর সুপণ্ডিত সাধক স্বামী রামানন্দ। তিনি কবীরের ভক্তি ও আকুলতা দেখে মুগ্ধ হলেন, তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। দীক্ষাদান করলেন।

স্বামী রামানন্দের প্রেরণায় কবীর হতাশামুক্ত হলেন। তাঁর শিক্ষায় কবীর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হতে পারলেন। রামানন্দের পরামর্শে তিনি দোঁহা বা দুইচরণবিশিষ্ট হিন্দী ভক্তিগীতি রচনা শুরু করলেন।

প্রায় ছ'শ' বছর ধরে কবীরের দোঁহাগুলি ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তাঁর রচিত অনেকগুলি দোঁহা শিখদের গ্রন্থসাহেবে সন্নিবদ্ধ হয়েছে।

কবীর বলতেন—সংসারে সবাইকে কাজ করতে হবে, কিন্তু নিজের জন্য সঞ্চয় করা চলবে না। উদ্বৃত্ত অর্থ অপরের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে।

তিনি বলতেন—সত্যের অনুগামী হও, প্রেম বীর্য আর করুণায় প্রতিষ্ঠিত সত্যকে মনের মধ্যে উপলব্ধি করো। ধর্মমতের পার্থক্য শুধু নামে। যে নামেই ডাকো ঈশ্বর ঈশ্বরই। তাঁকে তীর্থে, শাস্ত্রগ্রন্থে কিম্বা পূজা-পার্বণে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাবে আপন অন্তরে।

কবীর নিজে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নি। দেহরক্ষার পরে তাঁর মুসলমান শিষ্যরা মখর নামে জায়গায় একটি মঠ তৈরি করেন। আর হিন্দু শিষ্যরা বারাণসীতে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থের নাম রাখেন বীজক।

এক কথায় কবীর সারাজীবন মানুষের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। আজকের

বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে তিনি আমাদের পরম প্রেরণা। এসো, তাঁর পদরেণুরঞ্জিত ঘাটটির উদ্দেশে বিনম্র প্রণাম জানিয়ে আমরা অভিন্ন মানবাত্মার বিজয় ঘোষণা করি।

॥ এগারো ॥

ব্রহ্মাঘাট ও গয়াঘাট ছাড়িয়ে এলাম। মাঝি বলে দিলেন বলেই বুঝতে পারলাম ঘাট। বাঁধানো তো নয়ই, কোন স্নানার্থীও নেই। অথচ মনে পড়ে ১৮২৭ সালে আঁকা প্রিন্সেপ সাহেবের একখানি ছবির কথা। অনেক ছোট-বড় নৌকা, বহু নারী-পুরুষ স্নানার্থীর ভিড়। ঘাটের ওপরে একাধিক মন্দির। তখন ব্রহ্মাঘাট বেশ জমজমাট ও জনপ্রিয়।

একটু বাদে মাঝি আবার বলেন—এটা ত্রিলোচন ঘাট।

—আমি ত্রিলোচন মানে জানি। বাবলা মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

ওর কথা শুনে হাসি পায়। হাসি থামলে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করে—বল্ তো কি?

—যাঁর তিনটে চোখ তাঁকে ত্রিলোচন বলে।

—তিনি কে?

—শিব। তাঁর কপালের ওপর আরেকটা চোখ আছে। তাই শিবের নাম ত্রিলোচন।

—সাবাস বেটা! জীতা রহো! সুধাংশু বাহবা জানায়। কিন্তু ধীরেন নীরব। বোধকরি পুত্রের কৃতিত্বে গৌরব বোধ করছে।

আমার দিকে তাকিয়ে টুকু বলে—আপনি কিছু বলবেন কি দাদা!

—কি বলব?

—ত্রিলোচন ঘাটের কথা!

একটু ভেবে নিয়ে বলি—ত্রিলোচন কাশীব একটি প্রাচীনতম ঘাট। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ ঘাটের ওপরে ত্রিলোচন মহাদেবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাশী-মাহাত্ম্যে এই লিঙ্গমূর্তির প্রচুর প্রশংসা করে অবশেষে বলা হয়েছে ত্রিলোচন মহাদেবকে দর্শন না করলে কাশী দর্শনের ফল হয় না।

—আমরা যে দর্শন করলাম না! টুকুর সঙ্গে অর্চনা আর অঞ্জুও গলা মেলায়।

হেসে বলি—কাশীমাহাত্ম্যের সব নির্দেশ পালন করতে হলে দশদিনে কাশীদর্শন শেষ করতে পারবে না, অন্তত দশ সপ্তাহ ধরে কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। কারণ ১৯০৫ সালে লেখা একখানি বইতে প্রখ্যাত চিত্রবিদ ই. বি. হাভেল বলেছেন, তখনি কাশীতে দেড় হাজারের মতো বড় হিন্দুমন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এখন আরও অনেক বেশি হয়েছে।

নৌকো এগিয়ে চলেছে। সামনেই মালব্যপুল। যে পুল পার হয়ে কাশীতে আসা-যাওয়া। পুলের আগে প্রহ্লাদ ঘাট আর পুলের পরে রাজঘাট। আমাদের শেষ দর্শন। রাজঘাট থেকে আমরা ফিরে যাবো দশাশ্বমেধে।

কিন্তু ফেরার কথা থাক, ওদের কাছে প্রহ্লাদঘাটের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। বলতে শুরু করি—মালব্য সেতুর আগে শেষ বাঁধানো ঘাট এই প্রহ্লাদঘাট। ফলে কাশী শহরের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা এখানে নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন। আর

তাঁদেব সঙ্গে কিছু তীর্থযাত্রীও আসেন।

একটু থেমে ইসাবা কবে বলি—ঘাটেব ঐ যে বড় গাছটা দেখছ ওটা অশ্বত্থ গাছ, গোড়া বাঁধানো। ঐ গাছেব গোড়ায় কয়েকটি পুবনো দেবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ বয়েছে। আব আছে গুটিকয়েক ভাবী সুন্দব শিবমন্দিব। তোমবা সবাই আশা কবি বিষ্ণুভক্ত সাধকশ্রেষ্ঠ বালক প্রহ্লাদেব কথা শুনেছো। তাবই স্মৃতিবক্ষাব উদ্দেশ্যে এই ঘাটেব নাম প্রহ্লাদঘাট।

—সামনে ওটা কোন্ স্টেশন জেঠু? আমি থামতেই বাবু প্রশ্ন করে।

কিন্তু আমি উত্তব দিতে পাবাব আগেই বাবলি বলে—কাশী বেলস্টেশন। আসাব সময় দেখলি না? এবই মধ্যে ভুলে গেলি!

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সবি!

কিন্তু বাবুব ফবমাশ শেষ হয না। সে আবাব আমাকে বলে—এখন তুমি আমাদেব একটু পুলটাব কথা বলো।

—পুলটিব কথা বলতে হলে আগে এই জাযগাটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে।

—বেশ বলো।

আমি শুরু কবি—পুণ্যভূমি ভাবত। দেবালয় হিমালয় থেকে দেবীতীর্থ কন্যাকুমাবিকা। এই বিচিত্র সুন্দব সুবিশাল দেশে বয়েছে আকাশচুম্বী পর্বতমালা, শ্যামল কোমল সমতল, মালভূমি আব বনভূমি, নদী আব সাগব। বয়েছে শত শত তীর্থ, হাজাব হাজাব নগব আব লক্ষ লক্ষ গ্রাম। সেই সুদূব অতীত থেকেই এদেশেব মানুষ উত্তব থেকে দক্ষিণে আব পূব থেকে পশ্চিমে যাতাযাত কবেছেন।

এই যাতাযাতেব কাবণ কখনও বাজ্য জয, কখনও ব্যবসা-বাণিজ্য, কখনও বা তীর্থযাত্রা। যাতাযাতেব পথে একটা বড বাধা নদী। তাই নদীগুলো পাবাপাবেব জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট স্থান ছিল, যেসব জাযগা থেকে নদী পাবাপাব কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাছাড়া পাবাপাবেব ভাল ব্যবস্থা থাকত সেসব জায়গায়।

পূর্ব ভাবত থেকে উত্তব ভাবতে যাবাব পথে কাশীব এই ঘাট ছিল তেমনি একটি জনপ্রিয় স্থান। তাছাড়া কাশীব যাত্রীবা এখানে গঙ্গা পাব হবাব সময় ভাবতেন, তাঁবা সংসাব-নদী অতিক্রম কবে মোক্ষদ্বাবে উপনীত হতে চলেছেন। তাই কয়েকজন বিদেশী পর্যটক এই জাযগাটিকে বলেছেন—'Sacred Crossing of India'

সত্যই পবিত্র। কাবণ আড়াই হাজাব বছব আগে ভগবান বুদ্ধদেব গয়া থেকে কাশী আসাব সময এখান দিয়েই গঙ্গা পাব হয়েছিলেন। আব আজও অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন এই পথে কাশী আসছেন। পাবাপাবেব পদ্ধতি পবিবর্তিত হয়েছে কিন্তু জাযগাটি একই বয়ে গিয়েছে।

ওবা মাথা নাড়ে। আমি আবাব বলতে থাকি—তোমবা জানো, হুমায়ুনকে পবাজিত কবাব পবে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেব খাঁ শেব শাহ নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন। তাবপবে মাত্র পাঁচ বছব বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু তাবই মধ্যে তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কবে বিভিন্ন জনহিতকব কাজ কবেছিলেন। তাব মধ্যে দুটি হল যোগাযোগ ও পবিবহন ব্যবস্থা। তিনি ঘোড়াব ডাকেব প্রচলন ও ঢাকাব সোনাবগাঁ থেকে

সিন্ধুনদ পর্যন্ত সড়ক তৈরি করেন। সেই সড়ক ধরে পরবর্তীকালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি হয়েছে। সে রাস্তা কলকাতা থেকে দিল্লী গিয়েছে এই পুলের ওপর দিয়ে। কিন্তু আগে তো এই পুল ছিল না। তখন ছিল নৌসেতু। মানে ওপার থেকে এপার পর্যন্ত গঙ্গার বুকে নৌকো বেঁধে তারই ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করত। তারপরে তৈরি হয় ভাসমান সেতু পনটুন্-ব্রিজ। অবশেষে এই রেলপুল।

১৮৮০ সালে তৈরি শুরু হয়ে ১৮৮৩ সালে এই রেলসেতু শেষ হয়। পনেরোটি পিলার-এর ওপরে ৩৫৮ ফুট লম্বা এই পুলটি তৈরি করতে একশ' দশ বছর আগেও পঁচাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। তখন কেবল রেল চলাচল করতে পারত আর নাম ছিল ডফ্‌রিণ ব্রিজ। পরে রেলসেতুর সঙ্গে মোটরপথ তৈরি হয়। আর এখন এই পুলের নাম হয়েছে মালব্যসেতু। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে।

পুলের তলা দিয়ে নৌকো পুল পেরিয়ে এসেছে। এখন আমাদের বাঁদিকে রাজঘাটের উঁচু সমতল, অনেকটা মালভূমির মতো। এই মালভূমিসদৃশ উঁচু সমতলে প্রথম বারাণসী নগরীর পত্তন হয়। প্রাক-মুসলমান যুগে কাশীর অধিকাংশ মন্দির ও বাড়ি এখানেই গড়ে ওঠে। মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুব্-উদ্-দিন আইবেক ১১৯৪ সালে সহস্র বছরের সেই সুসভ্য জনপদকে ধ্বংস করেন। সে ধ্বংসলীলা এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়েছিল যে তারপরে আর এখানে জনবসতি গড়ে উঠতে পারে নি।

আমরা কাশী শহরের উত্তরসীমায় পৌঁছে গিয়েছি। আমাদের বাঁয়ে রাজঘাট, তারপরে বরুণাসঙ্গম। সঙ্গমে আদি কেশবের মন্দির, পঞ্চতীর্থের শেষ তীর্থ। তার মানে অসিসঙ্গম থেকে আট মাইল জলযাত্রা শেষ হল আমাদের।

মাঝি নৌকো থামায়। উঠে আসি আদি কেশবের মন্দিরে। ঘাটের নিচে জল চলে যাওয়ায়, নৌকোয় জুতো রেখে কাদা ভেঙে ঘাটের বাঁধানো ধাপে পৌঁছতে হয়েছে। ওপরে এসে পা ধুয়ে নিলাম।

গঙ্গাতীরে মন্দির, আমরা গঙ্গাপথে এলাম। কিন্তু বর্ষাকাল হলে নাকি গঙ্গা দিয়ে আসা সম্ভব হত না। কারণ এত উঁচু জায়গা হলে কি হবে, বর্ষাকালে এই ঘাট সম্পূর্ণ ভেসে যায়।

মন্দিরের অবস্থানটি চমৎকার। একে অনেকটা উঁচু, এখান থেকে গঙ্গা ও শহরকে ভারী সুন্দর দেখায়। তার ওপরে সামনেই সঙ্গম, বরুণা এসে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে।

—এ মন্দিরটা বোধহয় জায়গাটার মতই পুরনো? মন্দিরের সামনে এসে সহসা সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। মন্দির এখানে ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই। প্রাচীনতম পুরাণেও কাশীর কেশব মন্দিরের উল্লেখ আছে। এবং মুহম্মদ ঘুরীর কাশী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় তীর্থ ছিল। সর্বযুগে সর্বকালেই কাশীর রাজা এ মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে মন্দিরের এই বাড়িটি কিন্তু পুরনো নয়। কারণ অন্যান্য মন্দিরের মতো এ মন্দিরও প্রতি শতাব্দীতে অন্তত একবার করে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম সেরে বাইরে আসি। আবার গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াই। গঙ্গা-বরুণার সঙ্গমের দিকে আরেকবার তাকাই, সত্যই সুন্দর ভারী সুন্দর। মালব্য

সেতুটিকে দেখি, গঙ্গাকে দেখি, মোক্ষতীর্থ বারাণসীধামকে দেখি।

তারপরে সহযাত্রীদের দিকে ফিরে বলি—সেকালে পণ্ডিতগণ কাশীধামকে একটি মানবদেহ কল্পনা করে গিয়েছেন। বলেছেন—অসিসঙ্গম হল সেই দেহের মাথা। দশাশ্বমেধ হল বুক। মণিকর্ণিকা নাভি, পঞ্চগঙ্গা উরু আর এই আদি-কেশব পা-দুখানি।

বেঁচে থাকার জন্য চরণ-যুগল মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু একালের কাশী আদি-কেশবকে প্রায় বাদ দিয়েই বেঁচে আছে। এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত হয়েও আদি-কেশব এখন আর তেমন জনপ্রিয় তীর্থ নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কম হওয়া সত্ত্বেও বরুণা-সঙ্গমের চেয়ে অসি-সঙ্গমে যাত্রী সমাগম অনেক বেশি। কারণ বোধকরি দূরত্ব ও এদিকটায় জনবসতি কম বলে।

জনবসতি কম হলেও একথা সত্য নয় যে রাজঘাট মালভূমিতে আদি-কেশব মন্দির ছাড়া আর কিছু নেই। অ্যানী বেসান্ত কলেজ, কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশান এবং গান্ধী ইনস্টিটিউটের খেলার মাঠ এই মালভূমির ওপরেই। তবু এদিকটায় দর্শনার্থীর সংখ্যা বড়ই কম।

কাশীর ছাপ্পান্ন গণেশের দুটি গণেশও এখানেই বাস করেন। আমরা তাঁদের দর্শন করি। তারপরে আবার সারি বেঁধে নেমে চলি ঘাটে। এবারে ফেরার পালা। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। ফেরাব সময় উজানে যেতে হবে। তার ওপরে মণিকর্ণিকায় নামতে হবে একবার।

আমরা পায়ে হেঁটে পঞ্চতীর্থ পরিক্রমা করছি না। কোন ঘাটে স্নানও করি নি। তবু পঞ্চতীর্থ পরিক্রমার নিয়ম মেনে এই জলযাত্রা। পঞ্চতীর্থ পরিক্রমার নিয়ম হল অসি-সঙ্গমে স্নান করে পদযাত্রা শুরু। দশাশ্বমেধে দ্বিতীয়বার স্নান করে যাত্রীরা সোজা চলে আসেন এখানে এই তৃতীয় তীর্থ বরুণা-সঙ্গমে। তারপরে শুরু হয় ফেরার পালা। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে চতুর্থবাব স্নান কবে তাঁরা ফিরে যান পঞ্চম ও শেষতীর্থ মণিকর্ণিকায়। সেখানে পুণ্যস্নানের পরে পূর্ণ হয় পুণ্য-পরিক্রমা। আমরাও মণিকর্ণিকা দর্শন করে শেষ করব আমাদের জলযাত্রা।

আবার কাদা ভেঙে নৌকোয় পৌঁছই। পা ধুয়ে উঠে বসি। নৌকো চলতে শুরু করে। শেষ হল কাশীব ঘাট দর্শন। সেই সঙ্গে এক আনন্দময় গঙ্গা-ভ্রমণ। জীবনে হয়তো আর কোনদিন এতগুলো প্রিয়জনের সঙ্গে কাশীতে এমন নৌকাবিলাসের সুযোগ হবে না! তাই আজকেব এই আনন্দময় দিনটির কথা মনে থাকবে বহুদিন। মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই।

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু মাঝি ভোলেন নি। ব্রহ্মাঘাট ছাড়িয়ে আসার পরেই বললেন—ঐ যে নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট, ব্রহ্মা ও পঞ্চগঙ্গা ঘাটের মাঝখানে। ওখানেই রামানন্দজী মহারাজের প্রস্তর-পাদুকা বা পাথরের খড়ম রাখা রয়েছে।

—আর তৈলঙ্গস্বামীর আসন ছিল কোথায়?

—ঐ পঞ্চগঙ্গা ঘাটে।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আমি এখানে এসেছি, তবু ঠিক চিনতে পারছি না। পারব কেমন করে, আমি যে রিক্সায় চড়ে রাস্তা দিয়ে এসেছি।

—ওখানে কি আছে দাদা? টুকু জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—তৈলঙ্গস্বামীর একখানি ভারী সুন্দব পাথরের মূর্তি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, দক্ষিণ-কালীর বিগ্রহ এবং তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি দেবীযন্ত্র।

—তাহলে তো এখানেও একবার আসতে হবে আমাদের। সুধাংশু সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মাথা নাড়ি।

—জেঠু! তৈলঙ্গস্বামী মহারাজের কথা একটু বলো না! অপু অনুরোধ করে। অতএব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বলতে থাকি—

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী মহারাজ কাশীধামের অমূল্য রত্ন। তাঁর সুদীর্ঘ কাশীবাসের সময় দেশী-বিদেশী সব দর্শনার্থীরাই তাঁকে বিশ্বনাথ-জ্ঞানে প্রণাম করে গিয়েছেন। এমন কি স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁকে দর্শন না করলে সেকালে কাশীদর্শন পূর্ণ হত না।

তাঁর প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গস্বামী। কারণ তাঁর সংসারাশ্রমের নাম ত্রৈলিঙ্গধর। দাক্ষিণাত্যের হোলিয়া শহরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আনুমানিক ১৫২৯ সালে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম নৃসিংহধর। তিনি দুবার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম পক্ষের ছেলে ত্রৈলিঙ্গ আর দ্বিতীয় পক্ষের শ্রীধর। ত্রৈলিঙ্গের মা অতিশয়া বিদূষী যোগিনী ছিলেন। মায়ের কাছেই ত্রৈলিঙ্গ লেখাপড়া ও যোগাভ্যাস করতেন।

চল্লিশ বছর বয়সে ত্রৈলিঙ্গের বাবা মারা যান। তাঁর যখন বাহান্ন বছর তখন মা দেহরক্ষা করলেন। মায়ের মৃতদেহ সৎকার করে ত্রৈলিঙ্গ শ্মশান থেকে আর বাড়ি ফিরতে চাইলেন না। ছোটভাই শ্রীধর অনেক কান্নাকাটি করলেন। তবু তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হলেন। শুরু হল যোগীর জীবন-যাপন। এখানে ওখানে আসন পেতে যোগাভ্যাস, তারপরে আবার পথ চলা। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক নগর থেকে আরেক নগর, এক বন থেকে আরেক বনে।

এইভাবে বিশ বছর কেটে গেল। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় উপস্থিত হলেন। ভগীরথস্বামী নামে এক মহাযোগী তখন সেখানে বাস করছিলেন। ত্রৈলিঙ্গ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। স্বামীজি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীত হলেন। তিনি ত্রৈলিঙ্গকে নিয়ে পুষ্করে গেলেন। সেখানে স্বামীজি তাঁকে দীক্ষাদান করলেন। গুরু শিষ্যের নাম রাখলেন গণপতিস্বামী।

তারপরে শুরু হল গুরুর কাছে যোগশিক্ষা ও গুরুর সঙ্গে তীর্থ-পরিক্রমা। নানা তীর্থ পরিক্রমার পরে দুজনে কাশীতে এলেন। কাটালেন কিছুদিন। তারপরে আবার পুষ্কর। সেখানে একদিন ভগীরথস্বামী দেহরক্ষা করলেন। ত্রৈলিঙ্গ আবার একা।

গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পরে নিঃসঙ্গ ত্রৈলিঙ্গ আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। তীর্থ দর্শন করতে করতে রামেশ্বরম পৌঁছলেন। সেখানে অন্ধরাও নামে জনৈক মারাঠী ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করলেন।

তখন রামেশ্বরমে একটা মেলা চলছিল। সেই মেলায় কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে ত্রৈলিঙ্গের দেখা হয়ে গেল। দেখা পেয়ে তাঁরা ভারী খুশি হলেন। তাঁরা ত্রৈলিঙ্গকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বিরক্ত হলেন। প্রতিবেশীদের চোখে ধুলো দিয়ে সুদামাপুরীতে পালিয়ে গেলেন।

সেখানেও স্থায়ী হলেন না। কিছুদিন পরেই আবার শুরু হল তাঁর পথ-পরিক্রমা। দাক্ষিণাত্য থেকে আর্যাবর্ত, হিমালয়ের কোলে নেপাল, তারপরে কৈলাস ও মানস

সরোবর। মানস-সরোবরের তীরে বসে তিনি বেশ কিছুদিন যোগসাধনা করলেন।

তারপরে আবার দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর পথচলা শেষ হল না। চলতে চলতে তিনি নর্মদার তীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে পৌঁছলেন। কিছুদিনের জন্য সেখানে আসন গ্রহণ করলেন। সেখানেই একদিন থাকীবাবা নামে জনৈক সন্ন্যাসী প্রথম তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন নর্মদা দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হয়ে ত্রৈলিঙ্গের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আর তিনি সেই দুধ পান করছেন। থাকীবাবা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ছুটে এলেন। আর এসে সবিস্ময়ে দেখলেন দুধের নদী আবার জলের নদী হয়ে গিয়েছে।

মুগ্ধ থাকীবাবা আশ্রমে ফিরে এসে ঘটনাটি তাঁর গুরুভাইদের জানালেন। তাঁরা সকলেই তখন ত্রৈলিঙ্গস্বামী মহারাজের প্রতি আরও বেশি ভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ভক্তদের আদর-যত্ন তাঁকে মায়ায় আবদ্ধ করতে পারল না। কিছুদিন বাদেই মার্কণ্ড আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথচলা শুরু করলেন। চলতে চলতে প্রয়াগে এলেন। সেখানে কাটালেন কিছুকাল। তারপরে আবার বারাণসী। কিন্তু এবার কাশী এসে অজ্ঞাতবাস করতে চাইলেন। তুলসীদাসজীর বাগানে আসন পাতলেন। পরিচিতদের এড়িয়ে চলতে থাকলেন।

মানুষের মঙ্গলের জন্য যিনি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে কি বেশিদিন এভাবে থাকা সম্ভব? কোন মুমূর্ষু রোগী দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাকে যোগবলে ভাল করে দিতেন। কথাটা ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হয়ে গেল। শত শত রোগী আসতে আরম্ভ করল। তাঁর অজ্ঞাতবাস ঘুচে গেল।

বাধ্য হয়ে তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে এলেন। রোগের চিকিৎসা ও মানসিক শান্তির জন্য দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলেন।

এই সময় কখনও ভিড় এড়াবার জন্য, কখনও বা লোকশিক্ষার জন্য তিনি মাঝে মাঝেই নানা অলৌকিক কাজ কবে ফেলতেন। যেমন প্রবল শীতে সারারাত গঙ্গায় গা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। অথবা প্রচণ্ড গরমে রোদের মধ্যে গঙ্গাতীরে গবম বালিব ওপরে সারাদিন শুয়ে থাকতেন।

স্বামীজি কখনও কারো কাছে খাবার চাইতেন না। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতেন। আবার কেউ ২০/২৫ সের খাবার নিয়ে এলেও সবটাই একসঙ্গে খেয়ে নিতেন। এবং খাবারের ব্যাপাবে তাঁর কোন জাত-পাতের বিচাব ছিল না।

এর আগে স্বামীজি সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু এবারে কাশী আসার পর থেকেই তিনি বড় একটা কথাবার্তা বলতে চাইতেন না। ইসারাতেই বেশির ভাগ মনের ভাব প্রকাশ করতেন। তবে কেউ কোন শাস্ত্রীয় সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করে দিতেন।

একদিন একজন ধনী তাঁকে বিশ ভরির একজোড়া সোনার বালা প্রণামী দিলেন। সেখানে তখন কয়েকজন দুষ্ট ও লোভী উপস্থিত ছিল। তারা বালাজোড়া হাতাতে চাইল। ভাবল, এ সাধুটার তো খাওয়ার বাছ-বিচার নেই। তাই এটাকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে বালাজোড়া নিয়ে নিতে হবে।

তারা মদ এনে স্বামীজিকে খাওয়াতে শুরু করল। স্বামীজিও বোতলের পর বোতল সাবাড় করে যেতে থাকলেন। এইভাবে ৭/৮ বোতল শেষ হয়ে গেল। অথচ

লোকগুলো অবাক হয়ে দেখল, সাধুটার বেহুঁশ হওয়া তো দূরের কথা, নেশা পর্যন্ত হয় নি। তখন তারা স্বামীজির অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। স্বামীজি একটু হেসে বালাজোড়া হাত থেকে খুলে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

স্বামী তৈলঙ্গজী মহারাজ কোন কাপড়-চোপড় পরতেন না, তিনি নাঙ্গা থাকতেন। এবং সেই অবস্থাতেই কাশীর পথে ঘুরে বেড়াতেন। এজন্য একদিন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করলেন। সাহেব তাঁকে বললেন—আপনাকে কাপড় পড়তে হবে, এভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবেন না। যদি আমার কথা না শোনেন, তাহলে আমি আপনাকে আমাদের খানা খাইয়ে দেব। আপনার জাত যাবে।

—জাত যাবে না, কারণ আমার কোন জাত নেই। তবে তুমি যদি আমার খানা খাও, তাহলে আমিও তোমার খানা খেতে পারি।

—আপনার খানা কি? সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

স্বামীজি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই আদালতগৃহে মলত্যাগ করে সেই মল খেতে শুরু করে দিলেন।

সাহেব বিচারকের চৈতন্য হল। তিনি হাতজোড় করে বললেন—আপনি মহামানব! আপনি যেভাবে ইচ্ছে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। আমি আপনাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলাম।

কিছুকাল পরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীতে এলেন। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কাশীতে তাঁর মত প্রচার আরম্ভ করলেন, বৈদিক দেব-দেবী পূজার অসারত্ব প্রমাণের জন্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকলেন। একদল মানুষ তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে সনাতন ধর্মের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ শুরু করে দিলেন। স্বামীজির কয়েকজন ভক্ত-শিষ্য বিচলিত হয়ে ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন—প্রভু! ধর্ম যে রসাতলে যায়। একটা উপায় করুন।

স্বামীজি তখন একটুকরো কাগজে কিছু লিখলেন। তারপরে সেটা ভাঁজ করে শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন—যাও, এটা গিয়ে দয়ানন্দকে দিয়ে এসো। আর কাউকে দেখিও না।

দয়ানন্দ চিরকুটটি খুলে একবার পড়লেন। তারপরেই সদলবলে তখুনি কাশী থেকে চলে গেলেন। সেই চিরকুটে কি লেখা ছিল তা স্বামীজি ও দয়ানন্দ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

১৮০৫ সালে তৈলঙ্গস্বামী মহারাজ পঞ্চগঙ্গার সঙ্গমে 'লাট' নামে একটি পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলে। বছর দুয়েক বাদে তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণ পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্বামীজির মর্মর মূর্তিটি স্থাপন করেন। এখনও প্রতিদিন শত শত যাত্রী সেই মূর্তিকে প্রণাম করে সাক্ষাৎ শিবপূজার পুণ্যলাভ করে চলেছেন।

—আমরাও আসব একদিন। টুকু মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে আবার শুরু করি—

দেহরক্ষার ঠিক পনেরদিন আগে স্বামীজি শিষ্যদের বললেন, আমার ঘরের

দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দাও। আমি সমাধিস্থ হবো।

আদেশ পালন করে শিষ্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। খবর পেয়ে দলে দলে ভক্ত ছুটে এসে তাঁদের সঙ্গে প্রতীক্ষা শুরু করলেন। দিন যায়, রাত আসে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়। স্বামীজি সমাধিস্থ হয়ে থাকেন।

ঠিক এক পক্ষকাল পরে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি নিজেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। শিষ্যদের মাঝখানে এসে যোগাসনে বসলেন। এবং একসময় তাঁর অমর আত্মা দেহমুক্ত হয়ে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন। সেদিন পৌষমাসের শুক্লা একাদশী, সময় সন্ধ্যা, ১৮০৯ সাল। ২৮৩ বছর পরে মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করে স্বামীজি মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন।

—দু'শ' আশি বছর বেঁচেছিলেন তিনি? সঙ্গীরা সমস্বরে বলে ওঠে।

মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ। এবং তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই-ই পৌষমাসে।

একবার থেমে আবার বলি—স্বামী তৈলঙ্গ মহারাজ 'মহাকাব্য রত্নাবলী' নামে একখানি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা কবে গিয়েছেন। এখানি ভারতীয় যোগদর্শনের অমূল্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত।

তৈলঙ্গস্বামী একজন অবতারসদৃশ মহাপুরুষ। তাঁব কৃপায় অসংখ্য মানুষ রোগ শোক ও অশান্তির জ্বালামুক্ত হয়ে সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কাশীবাসীবা তাঁকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বব বা জীবন্ত শিবরূপে পূজা কবতেন। প্রায় দু'শ' বছর হতে চলল তিনি অপ্রকট হয়েছেন। কিন্তু আজও তিনি কাশীবাসীদের ইষ্টদেবতা আর আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। এসো, সেই মহামানবের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন কবে আমরা কাশীদর্শন সার্থক করি।

ঘাটে এসে নৌকো লাগে, মণিকর্ণিকা ঘাট। ঘাটের চেহারা অনেকটা দশাশ্বমেধের মতো। এখানেও তেমনি বড়-বড় ছাতা অথবা ছাউনীর তলায় পুণ্যার্থীদের পূজাপাট আর স্নানার্থীদের প্রসাধনেব ব্যবস্থা। পাঠেব আসব আব পাণ্ডাদেব জটলা। সুধাংশু তাঁদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গী কবে নিল।

ঘাটেব ওপবে ঠিক মাঝখানে মণিকর্ণিকা কুণ্ড। পাণ্ডাজী প্রথমে আমাদের কুণ্ডেব সামনে নিয়ে আসেন। কুণ্ডেব চাবিদিকেই বাঁধানো ঘাট। আমবা ঘাটে নেমে জল স্পর্শ কবি।

পাণ্ডাজী বলেন—কুণ্ডটি লম্বা ও চওড়ায় ষাট ফুটের মতো। আর এর গভীরতা বিশ ফুট।

উঠে আসি ওপরে। কুণ্ডের চারিদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা। একদিকে রেলিং-এর পরেই কোন বাড়ি কিম্বা মন্দিবেব দেওয়াল। দেয়ালে সাদা চুনকামের ওপরে রং দিয়ে আঁকা মণিকর্ণিকাদেবীর কল্পিত ছবি। স্থানীযদের মতে ইনি মণিকর্ণিকার ইষ্টদেবী। মনে মনে বলি—তোমার করুণায় আমাদের কাশীদর্শন পূর্ণ হোক, সার্থক হোক, মধুময় হোক।

কুণ্ডের তীর থেকে পাণ্ডাজী আমাদের নিয়ে আসেন বিষ্ণুর চরণ-পাদুকার সামনে। একখানা গোলাকার শ্বেতপাথরের ওপরে একজোড়া পায়ের ছাপ। ১৮৩১ সালে

জেম্‌স প্রিন্সেপ যখন সরকারী কাজে কাশীতে ছিলেন, তখনও এই চরণ-পাদুকা এখানে প্রতিষ্ঠিত, এবং তীর্থযাত্রীরা এই পদচিহ্ন অতিশয় পবিত্র বলে জ্ঞান করতেন। তাই প্রিন্সেপ সাহেব এই চরণচিহ্নকে বলেছেন—'The holiest spot in the whole city.'

কথাটা বোধকরি এখনও মিথ্যে নয়। কারণ তারপরেও তো লক্ষ লক্ষ ভক্ত আমাদেরই মতো এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে। তাঁদের ভক্তিবিনম্র প্রণাম রেখে গিয়েছেন। ফুল ছড়িয়ে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন আর তীর্থদেবীর করুণা প্রার্থনা করেছেন। বিগত দেড় শতাব্দীতে জগতের কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ভ্রূকুটি অবহেলা করে পবিত্র চরণ-পাদুকা একইভাবে পূজিত হয়ে চলেছেন।

চরণ-পাদুকায় প্রণাম জানিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে আসি। পাণ্ডাজী বলেন—এই ঘাটের সর্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গমূর্তি।

আমরা প্রণাম করি। তারপরে পাণ্ডাজী আমাদের নিয়ে আসেন তীর্থদেবতার কাছে—মণিকর্ণেশ্বর মন্দিরে।

মেয়েরা পুজো দেয়। আমরা প্রণাম করি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি—আমাদের কাশী-দর্শন নির্বিঘ্ন হোক, নির্মল হোক, নিবেদিত হোক।

পাণ্ডাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি ঘাটে, উঠে বসি নৌকোয়। নৌকো ফিরে চলে দশাশ্বমেধে।

—জেঠু! এমন চুপচাপ কি ভাবছ বসে বসে?

অপুর প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। একটু হেসে বলি—ভাবছিলাম কাশীর কথা, গঙ্গার কথা আর আমাদের এই নৌকাবিহারের কথা।

—কিন্তু তুমি যে এখনও মণিকর্ণিকার কথাই শেষ করো নি!

অতএব পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়। বলি—মণিকর্ণিকা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ, সুপ্রাচিনও বটে। বৈদিকযুগ থেকেই মণিকর্ণিকা মহাতীর্থরূপে সমাদৃত। কাশী এসে যেমন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করতে হয়, তেমনি মণিকর্ণিকা কুণ্ডে ডুব না দিলে কাশীদর্শন অপূর্ণ থেকে যায়।...

—আমরা তো দিলাম না! টুকুর স্বরে হতাশা।

—এই রে, সেরেছে! সুধাংশু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—জলস্পর্শ করা আর ডুব দেওয়া একই কথা। কুণ্ডে নেমে জল হাতে নিয়ে গায়ে-মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে তুমি পুণ্যস্নানের ফল লাভ করেছো।

কথাটা বলে ফেলে বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। সুধাংশু আমার মুখরক্ষা করেছে। তাই সহাস্যে বলি—ঠিকই বলেছে। কথাটা খেয়াল ছিল না আমার।

টুকু কি বুঝল জানি না। তবে সে চুপ করে রইল।

ধীরেন নীরবতার অবসান ঘটায়। বলে—আচ্ছা, এই কুণ্ডটি পরিষ্কার করা হয় না?

—হয় বৈকি! মাথা নেড়ে উত্তর দিই—কার্তিক শুক্লা চতুর্দশীতে।

অর্চনা জিজ্ঞেস করে—মণিকর্ণিকার উৎসব কি তখুনি হয়?

—না। মণিকর্ণিকার মূল-উৎসব বৈশাখ মাসে, অক্ষয় তৃতীয়ায়।

আমি থামতেই মনোরঞ্জন বলে—গতকাল সন্ধ্যায় বাবুদের কাছে যে গল্প আপনি

বলেছেন, আমি শুনে নিয়েছি। কিন্তু কাশীখণ্ডে নাকি মণিকর্ণিকা সম্পর্কে আরও দুটি কাহিনী আছে!

—ঠিক কাহিনী নয়। দুটি মত বলতে পারো।

—যেমন?

—কাশীখণ্ডের এক জায়গায় বলা হয়েছে, কাশীতে যেসব সাধু ও ভক্ত তীর্থ করতে আসেন, তাঁরা মণিণকর্ণিকায় এলে বিশ্বনাথ তাঁদের কানে 'তারকব্রহ্ম' এই মন্ত্র দান করেন। তাই এ পুণ্যস্থানের নাম মণিকর্ণিকা।

—আরেকটা মত?

—কাশীখণ্ডে আরেক জায়গায় লেখা রয়েছে, এই পুণ্যভূমি মুক্তিদেবীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং বিশ্বনাথের চরণ-কমলের কর্ণিকাস্থম। আজ তোমরা সেই মহাতীর্থ দর্শন করতে পারলে। তোমরা আজ মহাদেবের মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হলে। তাই তীর্থদেবতাকে আরেকবার প্রণাম জানাও।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আমিও প্রণাম করি। সহযাত্রীরা সবাই অনুসরণ করে আমাকে।

গঙ্গা। গঙ্গা তো শুধু গঙ্গা নয়, গঙ্গা যে জীবনগঙ্গা। সেই গঙ্গা বেয়ে নৌকো চলেছে এগিয়ে। গেরুয়া গঙ্গায় গোধূলি এসেছে ঘনিয়ে। বারাণসীর মন্দিরে-মন্দিরে, মসজিদে ও প্রাসাদে, বাড়িতে অ' দোকানে আলো উঠছে জ্বলে। ভারী ভাল লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে জীবনগঙ্গায় ভাসতে ভাসতে জীবনের আলো দেখছি।

না। গঙ্গাও আলোহীন নয়। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে শুরু হয়ে গেছে সন্ধ্যারতি। আরতির পরে জ্বলন্ত প্রদীপ গঙ্গায় অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। আয়োজন সামান্য। শালপাতার ডোঙ্গায় মাটির ছোট্ট প্রদীপ। কিন্তু তারাই গঙ্গার গলায় আলোর মালা হয়ে দুলছে। দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে কপিলসদনে, সগর সন্তানদের শাপমুক্ত করতে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কাশী আর কাশীর প্রাণধারা গঙ্গা—তুলসীদাস কবীর ও ত্রৈলিঙ্গের গঙ্গা। সেই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে ফিরে চলেছি ঘরে। ভারী ভাল লাগছে। আমার মন ভরে উঠেছে আনন্দে। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার আনন্দনগরী দর্শন সার্থক হল।

।। বারো ।।

শেষ পর্যন্ত ছেলেদের দাবী মেনে নিতে হল। ট্যাক্সি কিম্বা অটো তো নয়ই, এমন কি রিক্সাও নয়। আজ সকালে আমরা টাঙ্গায় সওয়ার হয়েছি। আর এটাই ছিল ছেলেদের দাবী।

দাবীটা কিন্তু কোনমতেই অসঙ্গত নয়। কারণ কলের গাড়ি যতই বেগবান ও আরামদায়ক হোক, ঘোড়ার গাড়ির মতো রোমাঞ্চকর হতে পারে না। তাছাড়া ঘোড়া মানুষের প্রাচীনতম বাহন এবং এযুগেও তার বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। হিমালয়ের দুর্গম পথে এখনও আমরা ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়ে যাই।

আগেই বলেছি কাশীতে একসময় টাঙ্গাই অদ্বিতীয় বাহন ছিল। অতএব আজ অটো অথবা ট্যাক্সি পেয়ে টাঙ্গাকে ভুলে যাওয়া নিতান্তই বেইমানী হত। টাঙ্গার তাল তুলে তাই ছেলেরা একটা মহৎ কর্তব্য পালন করল।

বলা বাহুল্য প্রথম টাঙ্গাখানি ওদের দখলে। বাকি দুখানিতে আমরা সাতজন। এবং টাঙ্গা চলতে শুরু করার পরে সবাই স্বীকার করে নিল যে বাইরে বেড়াতে এসে একদিন অন্তত টাঙ্গা না চড়লে ভ্রমণটা পানসে হয়ে যায়।

যাক্‌গে, এবারে আসল কথায় আসা যাক। সকালে হোটেল থেকে রওনা হয়ে প্রথমেই আমরা সঙ্কটা মন্দিরে এলাম। গতকাল নৌকাভ্রমণের সময় সঙ্কটা ঘাট দেখেছি। তখন অর্চনাকে বলেছিলাম, একদিন গাড়ি করে সঙ্কটা মন্দিরে আসব। কিন্তু সেই আসা যে আজই হবে তা জানা ছিল না। জানব কেমন করে? অন্তর্যামী মা-সঙ্কটা যে আজই ডাক দিয়ে বসবেন, তা যে আগে জানার কথা নয়।

গলি পার হয়ে মন্দিরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াই। পাথর বাঁধানো অঙ্গন। চারিদিকেই দালান। খোলা বারান্দার পরে সারি সারি ঘর, দোতলা বাড়ি।

বাঁধানো উঠানের প্রায় মাঝখানে একটা বটগাছ। সাদা ও কালো পাথর দিয়ে গোড়া বাঁধানো। গাছের ছায়ায় একটি লিঙ্গমূর্তি ও কয়েকটি অন্যান্য দেব-দেবীর বিগ্রহ।

উঠান পার হয়ে মায়ের মন্দির। শ্বেতপাথরের দু-ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এলাম। দরজার সামনে সিংহমূর্তি। দরজাটি কাঠের, কারুকার্যখচিত। দরজার দু-পাশে দেওয়ালে স্বস্তিকা আঁকা।

মন্দিরের বারান্দায় সিংহমূর্তির পাশে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেবী সঙ্কটার ব্রতকথা পাঠ করছেন। কণ্ঠস্বরটি মিঠে। তাঁর মাথায় বড়-বড় চুল, সারা মুখে সাদা দাড়ি, চোখে চশমা। চেহারাটি ভারী সৌম্য। বারান্দার আরেকদিকে কয়েকজন নারী-পুরুষ চুপচাপ বসে রয়েছেন। বোধকরি পাঠ শুনতে শুনতে মা-সঙ্কটাকে স্মরণ করছেন।

—এত ভিড় কেন? আজ কোন বিশেষ উৎসব আছে নাকি? অঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

জনৈক পূজারী উত্তর দেন—*না। মায়ের বিশেষ পূজা শুক্রবার সকালে। সেদিন ভিড় হয়। একে ঠিক ভিড় বলা যায় না।*

—মন্দিরের ভেতরটা এমন অন্ধকার! টুকু বলে ওঠে।

—মন্দিরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাবার নিয়ম নেই, কেবল ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে।

—অদ্ভুত নিয়ম। বাইরে আলো, ভেতরে অন্ধকার। সুধাংশু বিরক্ত।

ব্যাপারটা সত্যিই বিরক্তিকর। বিগ্রহ দর্শন করতে মন্দিরে আসা। অথচ আলোর অভাবে সে দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রাকদশকে মধ্যযুগীয় নিয়ম বলবৎ রয়েছে। অথচ এ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। একজোড়া শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী আমাদের সঙ্গে মন্দিরের ভেতরে চলে এসেছে।

সেবাইত দেবী সঙ্কটার বৈশিষ্ট্য কীর্তন করেন। আমরা শুনি। সেবাইত বলছেন—একালে মা-কে সঙ্কটা বললেও, কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে বিকটা মাতৃকা। অথচ তাঁর উৎপত্তির উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বাবা বিশ্বনাথের মতো মা সঙ্কটাও স্বয়ম্ভু। তিনি নিজেই এখানে প্রকট হয়েছেন। এবং তা অন্তত দ্বাপরযুগে। কারণ বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব যখন বারাণসী আসেন, তখন তাঁরাই প্রথম মা-সঙ্কটাকে প্রত্যক্ষ করেন। যুধিষ্ঠির মায়ের কাছে সঙ্কট-মুক্তির প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। এবং মা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।

মেয়েরা মন্দিরে পুজো দিচ্ছে। আমি এখানে একা দাঁড়িয়ে থেকে কি করব? প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। উঠানে নেমে বটগাছের গোড়ায় এসে বসি। বসে বসে ভাবতে থাকি সঙ্কটা মায়ের কথা।

মা-সঙ্কটা কাশীধামের শক্তিশালী দেব-দেবীদের অন্যতমা। তবু নাকি বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের ভিড় খুবই কম এ মন্দিরে। কারণ মন্দিরের অবস্থানটি ভাল নয়। অবশ্য স্থানীয়রা, বিশেষ করে মেয়েরা, অনেকেই নিয়মিত আসেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, মায়ের করুণায় তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সকল সঙ্কট দূর হয়ে যাবে।

মন্দিরের বাইরে মনোহারী দোকানে হিন্দীতে লেখা 'সঙ্কটা ব্রতকথা' কিনতে পাওয়া যায়। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বারান্দায় বসে সেই ব্রতকথা পাঠ করছেন।

ওদের পুজো দেওয়া হয়েছে। ওরা উঠানে নেমে এসেছে। সঙ্গে পূজারী। আমাকে প্রসাদ দিয়ে ওরাও এসে বটের ছায়ায় দাঁড়ায়। পূজারী বলেন—যেসব মায়েরা মা-সঙ্কটার ব্রত পালন করতে চান, তাঁরা শুক্রবার সকালে গঙ্গাস্নান করে ধোয়ানো শাড়ী পরে চলে আসবেন এখানে। বাইরের কোন ডালার দোকানে টাকা দিলেই তারা ফুল ধূপ ও মিষ্টি একখানি থালায় সাজিয়ে দেবে। মন্দিরে এসে থালাখানি মায়ের সামনে রেখে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মা-সঙ্কটার ব্রতগান করবেন। গান শেষ হলে চোখ বুজে হাতজোড় করে মায়ের কাছে স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনা করবেন।

—বিবাহিত মহিলারাই বুঝি কেবল সঙ্কটা মায়ের পুজো দিতে পারেন?

টুকুর প্রশ্নের প্রতিবাদ করেন পূজারী—না, না। কুমারী মেয়েরাও মায়ের ব্রতপালন করে। মায়ের আশীর্বাদে তারা শিবের মতো বর পায়। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরাও আসে, মা তাদের পরীক্ষার বৈতরণী পার করে দেন।

—আরেকটা কথা। অর্চনা বলে—শুনেছি, মা-সঙ্কটার কথা মনে রেখেই নাকি শুক্রবারে মা সন্তোষীর পূজার প্রচলন করা হয়েছে'?

—ঠিক জানা নেই আমার। তবে হতে পারে। কারণ দুজনেই লৌকিক দেবী।

সঙ্কটা মন্দিরের পেছনদিকে রয়েছে আত্মবিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সেখানেই মঙ্গলেশ্বর ও বুদ্ধেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি আর নবদুর্গার অন্যতমা দেবী কাত্যায়নী। পূজারী ওদের দর্শন করিয়ে আনেন।

অবশেষে আমরা বৃহস্পতিশ্বরকে দর্শন করি। সঙ্কটা মন্দিরের সামনে সদা বিরাজমান। শিবরূপী দেবগুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি সঙ্কটা মন্দির থেকে।

টাঙ্গা চলেছে এগিয়ে। এখন কালভৈরব মন্দিরে যাচ্ছি। ময়দাগঞ্জ ও বিশ্বেশ্বরগঞ্জের মাঝখানে টাউনহলের পেছনে কোতোয়ালীর কাছে কালভৈরব মন্দির। তাই তো হবে। কারণ কালভৈরব হলেন কাশীনগরীর নগরপাল অর্থাৎ কোতোয়াল। আর তাই বোধকরি তাঁর মন্দিরের কাছে একালের কোতোয়ালী স্থাপন করা হয়েছে।

টগবগিয়ে টাঙ্গা চলেছে। কাশীর জনাকীর্ণ পথ। চাবুকের হাতল চাকার মাঝে রেখে আর মুখে নানারকম আওয়াজ করে কোচোয়ান পথ পরিষ্কার করছে। কাশীর পথ চলতে চলতে আমি কাশীর কথা ভেবে চলেছি।

বৃদ্ধরা বলেন, চারযুগে কাশীর পাঁচনাম। সত্যযুগেব প্রথমদিকে নাম ছিল আনন্দবন। তাবপরে দেবাসুরের সংগ্রামেব পরে নাম হয় অবিমুক্তেশ্বর। তখন মহারাজা দিবোদাস কাশীর রাজা ছিলেন। ত্রেতাযুগে এই নগরীর নাম হয় বারাণসী, দ্বাপরে কাশী আর কলিতে বনারস।

আবার অনেকে বলেন, চারযুগে কাশীর চারনাম—শঙ্খকাশী, চক্রকাশী, গদাকাশী ও পদ্মকাশী। তাঁদের মতে অযোধ্যা বিন্ধ্যাচল ও প্রয়াগ প্রভৃতি সবই সেসময় কাশীক্ষেত্রের মধ্যে ছিল।

আর যাঁরা চারযুগের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, অথচ কাশীর ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরা বলেন, কাশী নামটি খুবই পুরনো। এবং এ নামটি কেবল এই নগরেব নাম নয়, সারা রাজ্যেরই নাম ছিল কাশী। রাজধানীর নামেই রাজ্যের নাম। রাজধানী অর্থাৎ এই নগরীর নাম অবশ্য মাঝে মাঝে বদলে গিয়েছে। যেমন একসময় এই নগরীকে বলা হত 'প্রতিষ্ঠান'। আবার ১০১৭ সালে এই রাজ্যে 'বানার' নামে এক শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করতেন। নিজের নামানুসারে তিনি তাঁর রাজধানীব নতুন নাম রাখেন 'বানারস'। তাব মানে বানারস নামটি ইংরেজদের দেওয়া নয়, এটিও একটি প্রাচীন নাম। আর বরুণা ও অসি নদীর নাম থেকে যে 'বারাণসী' নামটি এসছে সেকথা তো সবাই জানেন।

একদল ঐতিহাসিক বলেন, কাশী নামটি এসেছে 'কশ' শব্দ থেকে। সেকালে ভারতে কশ নামে এক জাতি ছিল। কাশীখণ্ডে বর্ণিত রাজা দিবোদাস ছিলেন কশজাতি নরপতি।

আরেকদল ঐতিহাসিক বলেন, কাশী নামটি এসেছে কাশফুলের নাম থেকে। সেকালে নাকি বরুণা ও অসি নদীর মাঝে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচুর কাশফুলের বন ছিল। সেই বন কেটে কাশী নগরীর পত্তন হয়।

তবে বারাণসী নামটাও বেশ পুরনো। কারণ বৌদ্ধজাতকে বার বার এই নামটির উল্লেখ রয়েছে। মুসলমান যুগেও কাশীকে বারাণসী বলা হত। বৃটিশযুগে বলা হয়েছে বানারস আর স্বাধীন ভারতে বলা হচ্ছে বনারস। কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে কাশী কেবলই

কাশী। অতীতে কাশী, বর্তমানে কাশী, ভবিষ্যতেও কাশী।

কাশীর পথ চলতে চলতে আমি কাশীর কথাই ভেবে চলি। অবশ্যি আক্ষরিক অর্থে কাশীর নিজের কোনো কথা নয়। আমি ভাবছি কাশীতে আসা কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের কথা।

তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাশী এসেছেন। কিন্তু কাশী সম্পর্কে তাঁদের উক্তিগুলো প্রায় অভিন্ন। যেমন ফ্রসোয়া বের্ণিয়ের (Francois Bernier) কাশীকে বলেছেন—'Athens of India.' এডউইন আর্নোল্ড বলেছেন—'The Oxford and Canterbury in one'. লেঃ কঃ ডেভিডসন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—'It is the Hindoo Jerusalem.' নর্ম্যান ম্যাক্লিয়ড নামে আরেকজন পর্যটক লিখে গিয়েছেন—'Benares is to the Hindoos what Mecca is to the Mohammedans, and what Jerusalem was to the Jews...

আমি আজ আবার সেই মোক্ষতীর্থ বারাণসী ধামের পথ-পরিক্রমা করছি। আমার মন উদ্বেলিত, হৃদয় রোমাঞ্চিত, শরীর শিহরিত।

কিন্তু তা হলেও আপাতত আর কাশীর ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকা গেল না। টাঙ্গা থেমেছে। কোচোয়ান বলছে—কালভৈরব মন্দির এসে গিয়েছে।

অতএব নেমে আসতে হয় টাঙ্গা থেকে। কাজটা কোনমতেই সহজ নয়, বিশেষ করে আমার পক্ষে—ভাঙা পা আর বুকে পেস্‌মেকার।

সুতরাং সাবধানে নেমে আসি পথে—ভৈরব মার্গে। পাশের সরু গলি দিয়ে সাবি বেঁধে এগিয়ে চলি কালভৈরব মন্দিরের দিকে।

বাঁদিকে মন্দিরতোবণ, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া। তোরণ থেকে শ্বেতপাথরের টাইল্‌স দিয়ে বাঁধানো উঠান। উঠানের দু-পাশে উঁচু খোলা বারান্দায় স্তম্ভের সারি। বারান্দার পরে ঘরের সাবি।

উঠানের শেষে নাটমন্দির, সামান্য উঁচুতে। মাত্র একখানি সিঁড়ি। নাটমন্দিরের চারিদিক খোলা, কয়েকটি স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ছাদটা।

মন্দিরটা মোটেই পুরনো নয়। আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার পরে প্রায় শ'খানেক বছর ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। অবশেষে ১৮২৫ সালে পুনার রাজা রাওজী এই মন্দির তৈরি করে দেন।

—আচ্ছা মন্দিরের উঠোনে এতবড় একটা কুকুরের মূর্তি কেন?

মনোরঞ্জনের প্রশ্নে সবার সারমেয় মূর্তিটার দিকে নজর পড়ে। আমিও সেদিকে তাকাই। বলি—তোমরা জানো শিবের বাহন নন্দী বা বৃষ। তাই শিবমন্দিরে নন্দী মূর্তি থাকে। কালভৈরবের বাহন সারমেয় মানে কুকুর।

—কিন্তু কেবল তো কুকুরের মূর্তি নয়, জীবন্ত কুকুররাও যে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামড়-টামর দেবে না তো? ধীরেনের কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ভয় মেশানো।

হেসে বলি—দিতে পারে। এবং দিলে বোধকরি বাবা কালভৈরবের অক্ষয় কৃপা লাভ করতে পারবে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। ভক্তরা খেতে দেয় বলে এখানে এত কুকুর। তাছাড়া এখানে কুকুর তাড়াবার নিয়ম নেই।

অতএব অসহায় সহযাত্রীরা কালভৈরবজীর বাহনবাহিনীর দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

উঠানের পশ্চিম পাশে মা শীতলার ছোট মন্দির। আমরা দর্শন করি। তারপরে উঠে আসি নাটমন্দিরে।

নাটমন্দির পেরিয়ে গর্ভমন্দির। শ্বেতপাথরের দেওয়াল আর মেঝে, একেবারে ঝকঝক করছে। তবে গর্ভগৃহটি আকারে ছোট। দরজার দু-পাশে দুজন দ্বারপালের মূর্তি। আর দেওয়ালে দশাবতারসহ কয়েকজন দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত।

গর্ভমন্দিরে শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে কুকুরের পিঠে বসে আছেন কালভৈরব। গাঢ় নীলরঙের চতুর্ভুজ প্রস্তরমূর্তি। গলায় মুণ্ডমালা।

কাশীর রক্ষক কালভৈরবকে দর্শন করি, প্রণাম করি।

মন্দিরের দেওয়ালে দুর্গা গণেশ ও সূর্যদেবের রঙীন চিত্র, তাঁদেরও প্রণাম করি।

পূজারী বলেন—কালভৈরবজীকে প্রণাম করলে সবারই সব পাপ দূর হয়। আপনাদেরও তাই হল, আপনারা ভাগ্যবান।

ওদের কথা জানি না। তবে আমি অবশ্যই ভাগ্যবান। নইলে বাবা বিশ্বনাথ বার বার আমাকে এমন কাছে ডাকবেন কেন? কিন্তু পাপ করে এখানে এলে সত্যই কি তা দূর হয়?

পূজারী আবার পাপের প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন। বলেন—অগ্রাণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে এই মন্দিরে রাত জাগলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। আর ভক্তিসহ কালভৈরবের পূজা করে তাঁর কাছে কোন কামনা করলে তিনি তা পূর্ণ করেন।

তাহলেও আমরা পুজো দিতে সম্মত হই না। সুধাংশু সবিনয়ে বলে—ঠাকুরমশায়, আমাদের হাতে একদম সময় নেই। আপনি বরং এই দক্ষিণাটুকু রাখুন।

সে একখানি পঞ্চাশটাকার নোট বাড়িয়ে ধরে। পূজারীর চোখদুটি চকচক করে ওঠে। পুজোর আয়োজন না করেই পঞ্চাশটাকা!

নোটখানি হাতে নিয়ে হাসিমুখে পূজারী বলেন—আপনাদের কামনা পূর্ণ হবে।

মেয়েদের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। সুতরাং সুধাংশু মনোরঞ্জন আর ধীরেনও খুশি হয়।

নোটখানি রেখে দিয়ে পূজারী আমাদের প্রত্যেকের হাতে কালোসুতোর তাগা বেঁধে দেন। বলেন—কালভৈরবের আশীর্বাদী ডোরী। এতে আপনাদের সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।

পূজারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করি। সারি বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের পেছনদিকে আসি। দু-ধাপ বেদির ওপরে রাশিচক্র। সেইসঙ্গে সোম বুধ বৃহস্পতি শুক্র চন্দ্র সূর্য ও রাহু প্রভৃতির মূর্তি আর কয়েকটি শিবলিঙ্গ।

প্রদক্ষিণ শেষ হয়। গলিপথ ধরে ফিরে চলি টাঙ্গার কাছে।

উঠে আসি কোচোয়ানের পাশে। টাঙ্গা চলতে শুরু করে।

•

আজ আমার কি হয়েছে জানি না। গল্পও করছি না, আবার চুপচাপ বসে থাকতেও পারছি না। টাঙ্গা চলতে আরম্ভ করলেই কাশীর ভাবনা পেয়ে বসছে

আমাকে। মনে মনে ভেবে চলি সেইসব পাশ্চাত্ত পর্যটকদেরর• কথা, যাঁরা কাশীতে এসেই কাশীকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আর তা কেবল এযুগে নয়, চারশ' বছর আগের থেকে।

তাঁরা সবাই কাশী এসে খুশি হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন। অথচ তাঁরা বিভিন্ন পেশা ও মানসিকতার মানুষ। কেউ যুবক কেউ বৃদ্ধ, কেউ ব্যবসায়ী কেউ মিশনারী কেউবা রাজকর্মচারী।

এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন র‍্যাল্‌ফ ফিচ, জনৈক ইংরেজ পর্যটক। রাণী এলিজাবেথের পরিচয়পত্রসহ একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি ১৫৮৪ সালে ভারত ও চীনদেশ ভ্রমণে আসেন। তখন তিনি বেশ কয়েকদিন কাশীতে কাটান। কাশীর মন্দির ও বাড়ি-ঘর, গঙ্গা ও গঙ্গার ঘাট তাঁর বড়ই ভাল লেগেছিল। পুণ্যার্থীদের পূজা-পাট ও স্নানার্থীদের গঙ্গাস্নান দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন।

তাঁর প্রায় শ'খানেক বছর বাদে জঁ বাতিস্ত তাভের্নিয়ের (Jean Baptiste Tavernier) নামে জনৈক ফরাসী রত্ন-ব্যবসায়ী ভারতে আসেন। ১৬৩৬ থেকে ১৬৬৮ সালের মধ্যে তিনি ছ'বার ভারতে এসেছিলেন। সেকালের কাশী বিশেষ করে বিন্দুমাধব মন্দির সম্পর্কে তাঁর বিবরণ আজ খুবই মূল্যবান। কারণ তাঁর ভ্রমণের অনতিকাল পরেই আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী কাশী বিধ্বস্ত করে মন্দিরটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

দেড় শতাধিক বছব পরে ১৮২৩/২৪ সালে হেবার (Bishop Reginald Heber) নামে জনৈক ধর্মযাজক কলকাতা থেকে কাশী আসেন। কাশী শহরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরে তিনি লিখেছেন—

'a remarkable city, more entirely characteristicaly Eastern than any which I have yet seen.'

হেবারের কিছু পরে মিস এম্মা (Emma) রবার্টস নামে জনৈকা সুলেখিকা কাশী আসেন। তিনিও কাশীতে এসে বড়ই আনন্দলাভ কবেছেন। তবে পাশ্চাত্য পর্যটকগণ প্রায় প্রত্যেকেই কাশীর গঙ্গা ও গঙ্গার ঘাটগুলির বেশি প্রশংসা করেছেন। এবং মার্ক টোয়াইন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম নন।

কিন্তু তাঁর কথা তো গতকালই বলেছি। আর তাছাড়া এখন তাঁর কথা ভাবারও সময় নেই। আমরা যে ভারতমাতা মন্দিরের সামনে পৌঁছে গিয়েছি।

তাড়াতাড়ি নেমে আসি টাঙ্গা থেকে। ওদের কাছে আসতেই টুকু বলে—দাদা, আমরা তো এইপথেই হোটেলে ফিরব?

ঠিক বুঝতে পারছি না ওর কথা। কেমন করে বুঝব? আমি যে এতক্ষণ অতীতে বিচরণ করছিলাম। বর্তমানে ফিরে আসতে একটু সময় নেবে বৈকি!

টুকু কি বোঝে কি জানি। সে কিন্তু আমার নীরবতায় বিরক্ত হয় না। বরং আবার বলে—মানে, আমরা যে পথ দিয়ে এখানে এলাম, সেই পথ দিয়েই আবার হোটেলে ফিরে যাবো কি?

—একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

—তাহলে ফেরার পথে একবার স্বামীজির সঙ্গে দেখা করে যেতাম।

—কোন্ স্বামীজি?

—স্বামী সদাশিবানন্দজী। আমরা যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে দিয়ে এখানে এলাম!

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। আমরা বিদ্যাপীঠ রোড ধরে ভারতমাতা মন্দিরে এসেছি। সুতরাং ভারত সেবাশ্রম সংঘ পথে পড়েছে। অন্যমনস্ক ছিলাম বলে আমি ঠিক খেয়াল করি নি। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠি—নিশ্চয়ই! আমরা এইপথ দিয়েই হোটেলে ফিরব। বেশ তো, স্বামীজির সঙ্গে দেখা করে যাবো। এখন এসো, ভারতমাতা মন্দির দর্শন করা যাক।



মন্দিরের সামনে চমৎকার সবুজ লন আর গাছে ঘেরা বাঁধানো পায়ে চলা পথ। সেই পথ ধরে মন্দিরের সামনে আসি।

মন্দিরটি কিন্তু কোনমতেই মন্দিরের মতো নয়। একটি আধুনিক ডিজাইনের চৌকো দোতলা বাড়ি। দু-তলাতেই সামনে বারান্দা। নিচের তলায় গাড়ি বারান্দা আর দোতলায় ব্যালকনি।

নামে মন্দির হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে একটি শিক্ষামূলক জাতীয় সৌধ। প্রধান স্থপতি সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল। ১৯৩৬ সালে গান্ধীজি এখানকার মানচিত্রটির আবরণ উন্মোচন করেন।

মানচিত্র! হ্যাঁ, ঠাকুর-দেবতা নয়, মানচিত্র। এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। এখানে কোন যাগ-যজ্ঞ কিম্বা পূজা-পার্বণ হয় না। এখানে শুধুই একখানি মানচিত্র দেখতে আসা। এবং পুণ্যার্থীরা যে ভাব ও ভক্তি নিয়ে দেবমন্দিরে যান, তা নিয়েই এখানে আসেন। আমরাও তাই এসেছি।

বারান্দা পার হয়ে ভেতরে আসি। প্রকাণ্ড একখানি হলঘর। বাইরে থেকে দোতলা বাড়ি বলে মনে হলেও বাড়িটার এই বৃহত্তর অংশ ঠিক দোতলা নয়। দোতলায় কেবলি ব্যালকনি, চারিদিকে। মাঝখানটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। অর্থাৎ মন্দিরের ছাদটি দোতলার সমান উঁচু।

ব্যালকনিটুকু বাদ দিয়ে মন্দিরের সমস্ত মাঝখান জুড়ে মেঝেতে একখানি সুবিশাল মানচিত্র। যাকে ইংরেজিতে বলে 'Relief Map' আর বাংলায় ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র।

শ্বেতপাথরের ওপরে খোদাই করে নির্মিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী উঁচু-নীচু করে খোদাই করা হয়েছে। সমব্যবধানে স্থাপিত সমোন্নতি-সম্বলিত মানচিত্র।

হিমালয়সহ ভারতের সব বড় পাহাড়, গঙ্গাসহ ভারতের সব বড় নদী ও হ্রদ, উপত্যকা অধিত্যকা, সমভূমি মরুভূমি বনভূমি, তরাই তীর্থনগর, দ্বীপ বদ্বীপ সাগর, কি নেই এ মানচিত্রে!

সবার মতো আমরাও প্রথমে একতলায় চারিদিক ঘুঁরে ঘুরে মানচিত্রখানি দেখি। তারপরে উঠে আসি দোতলায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে দেখি। এবারেও চারিদিক ঘুরে ঘুরে।

দেখি আর ভাবি, এ তো মানচিত্র নয়, এ যে স্বয়ং ভারতমাতা। আমার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের ভারত, গৌতমবুদ্ধ আর মহাবীরের ভারত, শঙ্করাচার্য আর চৈতন্যদেবের ভারত, গুরু নানক আর শিবাজীর ভারত, বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের ভারত, গান্ধীজী মালব্যজী মৌলানা আজাদ আর নেতাজীর ভারত।

এঁরা সবাই এবং আরও অনেক মহাপুরুষ এই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। আজ তাঁরা কেউ নেই। কিন্তু সেই পরিক্রমা বন্ধ হয় নি, এখনও চলেছে। আজও তীর্থযাত্রীরা গোমুখীর জল নিয়ে রামেশ্বরম আসছেন আবার রামেশ্বরমের বালি নিয়ে গোমুখী যাচ্ছেন। অমরনাথ থেকে সোমনাথ, কামাখ্যা থেকে দ্বারকা, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর এবং আরও অসংখ্য পরিক্রমা প্রতিনিয়ত চলেছে।

তীর্থময় ভারত আর সব তীর্থের কেন্দ্রভূমি কাশী। পুব থেকে পশ্চিম আর উত্তর থেকে দক্ষিণের পথে তীর্থযাত্রীরা অন্তত একবার কাশী দর্শন করেন। না করলে তাঁদের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ ভারতের সব তীর্থ কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে।

তাই বোধকরি এখানেই ভারতমাতা মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এই অভিনব অথচ মহতী প্রচেষ্টার জন্য প্রতিষ্ঠাতাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসি ভারতমাতা মন্দির থেকে। আসার সময় সুবিশাল ভারতের সার্থক মানচিত্রখানির দিকে তাকিয়ে আপনমনে বলে উঠি—জয় হিন্দ্।

ভারতমাতা মন্দিরের পাশেই কাশী বিদ্যাপীঠ। এ রাস্তাটার নামও বিদ্যাপীঠ রোড। ভারত সেবাশ্রম সংঘ এই রাস্তার ওপরে।

ভারতমাতা মন্দির থেকে বের হয়ে আমরা বিদ্যাপীঠে গিয়েছি। ১৯২১ সালে গান্ধীজী বিদ্যাপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিদ্যালয়ের অবদান অনেকখানি। আমাদের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছিলেন। এখন এটি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যাপীঠ থেকে টাঙ্গায় চেপে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘে এসেছি। দেখা

হয়েছে স্বামী সদাশিবানন্দজী ও সুধাংশু মহারাজের সঙ্গে। তাঁরা এবং আশ্রমের অন্যান্যরা ভারী খুশি হয়েছেন। স্বামীজি আমাদের আরেকবেলা প্রসাদ পাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছেন। ঠিক হয়েছে যাবার দিন সকালে হোটেলের পাট চুকিয়ে সেবাশ্রমে চলে আসব। দুপুরবেলা প্রসাদ পাবো এবং বিশ্রাম করব। বিকেলে ওখান থেকে ধীরে-সুস্থে স্টেশনে চলে যাবো। আগেই বলেছি স্টেশন থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ খুবই কাছে। তাছাড়া আমরা কাশীতে এসে যেখানে প্রথম উঠেছিলাম, সেখান থেকেই এবারের মতো কাশীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাবে।

আজকের মতো দর্শন শেষ। এখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। বিদ্যাপীঠ রোড ধরে টাঙ্গা ছুটে চলেছে ঔরঙ্গাবাদ রোডের দিকে। ১৬৬০ সালে বিধ্বস্ত করার পরে আওরঙ্গজেব কাশীর নতুন নাম রেখেছিলেন মহম্মদাবাদ। সম্রাটের মৃত্যুর পরে সে নাম মুছে গেলেও বোধকরি এই ঔরঙ্গাবাদ রোডের মাঝে তাঁর নামটা আজও টিকে আছে কোনমতে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়লে ভারী অবাক হতে হয়। আওরঙ্গজেব প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। আর তাঁর দাদা দারাশিকো সিংহাসনে বসতেই পারেন নি। কেবল ছাত্রজীবনে তিনি কিছুকাল কাশীতে থেকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। অথচ আজও সেই জায়গাটি দারানগর নামে পরিচিত। সুফী ও শিয়া মতের অনুরাগী এবং ধর্ম-সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী প্রাজ্ঞ যুবরাজকে কাশীবাসীরা সেদিন যে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন, তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

কিন্তু দারাশিকোর কথা নয়, কাশীর পথ চলতে চলতে আমি কাশীর কথাই ভেবে চলি, আমাদের কাশী। আগেই বলেছি কাশীতে মন্দিরের সংখ্যা অগণিত। কোন তীর্থযাত্রীর পক্ষেই সব মন্দির দর্শন করা সম্ভব নয়। এবং মন্দির ছাড়াও কাশীতে বহু দেব-দেবী রয়েছেন। রয়েছেন পথের পাশে পাশে অলিতে গলিতে। রয়েছেন বাড়ি-ঘর আর মন্দিরের দরজা-জানলা ও দেওয়ালে। কাশীর পথে বেরুলেই চোখে পড়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর ছবি। কোথাও দুর্গা, কোথাও কালী, কোথাও অন্নপূর্ণা কোথাওবা হর-পার্বতী। কোথাও লক্ষ্মী-নারায়ণ, কোথাও রাধাকৃষ্ণ, কোথাও গণেশ আবার কোথাওবা রাম-রাবণের যুদ্ধ, আরও কতো। বর্ষায় এগুলো সব ধুয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার পরে বাড়ি-ঘর রঙ করার সময়ে আবার সব আঁকিয়ে নেওয়া হয়।

কাশীতে অধিকাংশ মন্দিরেই শিবলিঙ্গ। কিন্তু সেইসঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে রয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর বিগ্রহ। এই মূর্তিগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চক্ষুদান করা হয়েছে। এঁরা জড়পদার্থ নন, জীবন্ত। ভক্তরা এঁদের সঙ্গে কথা বলেন, এঁরাও ভক্তদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আর তাই আমরা মন্দিরে যাবার সময় বলি, দর্শন করতে চলেছি। পুজো নয়, বন্দনা নয়, দর্শন। কারণ তিনি যে আমাদেরি একজন, তাই তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করে আসা।

একই কারণে আমরা তীর্থভ্রমণে বের হই না, তীর্থযাত্রায় আসি। এবং তীর্থদর্শন কোনমতেই প্রমোদভ্রমণ নয়। আর তাই সেই সুদূর অতীত থেকে একই মানসিকতাকে আশ্রয় করে তীর্থযাত্রী চলেছেন এগিয়ে—এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থের পথে।

সেপথ দুর্গম অথবা সহজ হোক, পায়ে হেঁটে অথবা গাড়ি চড়ে যাওয়া যাক, তীর্থযাত্রা সর্বদাই তীর্থযাত্রা। আমরাও সেই যাত্রায় এসেছি। আজ মা-সঙ্কটা ও বাবা কালভৈরবকে দর্শন করে এখন চলেছি ফিরে।

আজকের মতো কাশীদর্শন শেষ হল কিন্তু কাশীর ভাবনার তো শেষ নেই। আর আগেই বলেছি, কাশীর পথ চলতে গেলেই কাশীর ভাবনা পেয়ে বসছে আমাকে। আমি তাই ভেবে চলি কাশীর কথা।

কাশী যে বর্তমান ভারতের সবচেয়ে পুরনো শহর ও বিশ্বের প্রচীনতম জীবন্ত নগরী এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবে থেকে এই জনপদ?

জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, কাশীরাজ প্রতিষ্ঠের পুত্র সুপার্শ্ব হলেন সপ্তম জৈন তীর্থঙ্কর। তিনি প্রতিষ্ঠান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্রতিষ্ঠের নামানুসারে তখন কাশী রাজ্যের রাজধানীকে বলা হত প্রতিষ্ঠান। কাজেই সেকালের প্রতিষ্ঠানই একালের কাশী।

কিন্তু সুপার্শ্বের সময়কাল কি? এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর নেই জৈনশাস্ত্রে। কেবল জানি তেইশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের দেহরক্ষার প্রায় দুশো বছর পরে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ পার্শ্বনাথের সময়কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। পার্শ্বনাথের ষোলজন আগের তীর্থঙ্কর সুপার্শ্ব। একজন তীর্থঙ্কর যদি গড়ে তিরিশ বছর জৈনগুরু থেকে থাকেন, তাহলে সুপার্শ্বের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক। তার মানে কাশীর বর্তমান বয়স প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। কারণ সুপার্শ্বের আবির্ভাবের আগের থেকেই প্রতিষ্ঠান একটি সমৃদ্ধ জনপদ।

রেভারেণ্ড ডঃ এম. এ. শেরিং নামে জনৈক সুপণ্ডিত মিশনারী বেশ কয়েকবছর কাশীতে ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি 'The Sacred City of the Hindoos' নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইখানিতে তিনি লিখেছেন, ভারতে আসার পরে আস্তে আস্তে আর্যরা যখন উত্তর-ভারতে নিজেদের বসতি বিস্তার করছিলেন, তখুনি কাশী নগরীর পত্তন হয়। সুতরাং কায়রো বেবিলন ট্রয় এথেন্স ও রোমের চাইতে কাশী প্রাচীনতর।

শেরিং সাহেবও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে কাশী পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবন্ত শহর, 'Oldest living city.' কাশী যেমন প্রাচীন, তেমনি নবীন। কাশী বার্ধক্যের বারাণসী আবার যৌবনের উপবন।

কাশী শহরের স্থান নির্বাচনের মধ্যে আর্যদের গভীর গবেষণা ও দূরদর্শিতাব পরিচয় পাওয়া যায়। জল ছাড়া জনপদ গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কাশী কেবল গঙ্গাতট নয়। গঙ্গা এখানে উত্তর-প্রবাহিণী এবং এখানে গঙ্গাতট পাথুরে মালভূমির মতো। আজও গঙ্গায় কাশীর দিকে চড়া পড়ে নি, ভাঙন ধরে নি। গঙ্গায় জল বাড়লে কাশী শহর প্লাবিত হয় না। এবং কাশীতে কখনও ভূমিকম্প হয় নি। তার ওপরে তিন নদী যেমন সেকালে সীমান্ত রক্ষা করেছে, তেমনি একালেও জলের যোগান দিয়ে পরিবহনের সুবন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের কথা বৌদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস আজও নীরব। কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে কাশী যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও শিষ্টাচারে ভারতের প্রধান নগরী হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরে

বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য গয়া থেকে কাশী চলে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি কাশীতে যদি তাঁর ধর্মপথ অন্তত কিছুটা স্বীকৃতিলাভ করতে পারে, তাহলেই একদিন তা বৃহত্তর ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সারনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হবার পরেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাশী পেছিয়ে পড়ে নি। কারণ বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের প্রায় পাঁচ-শ' বছর পরে যিশুখ্রীষ্ট কাশী এসেছিলেন। লাদাখের হেমিস গুম্ফায় প্রায় ন'বছর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের পরে তিনি কাশীতে আসেন। এবং বেশ কয়েক বছর এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে রাজগীর ও কপিলবস্তু হয়ে দেশে ফিরে যান। তিনি প্রায় পনেরো বছর ভারতে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ থেকে আঠাশ বছর। *

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং য়ুয়ান চোয়াঙ যথাক্রমে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ ও সপ্তম শতকে কাশী আসেন। তাঁদের ভ্রমণ-বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন কাশী ভারতের একটি প্রধান রাজ্য। রাজ্যের পরিধি ছিল ৬৬৭ মাইল। রাজ্যের পশ্চিম সীমায় গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছিল রাজধানী কাশী নগরী। লম্বায় তিন ও চওড়ায় এক মাইল বিস্তৃত এই নগরী ছিল অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল। বহু বড় বড় বাড়ি ছিল সেই শহরে। নাগরিকগণ যেমন স্বচ্ছল, তেমনি শিক্ষিত ও অমায়িক। বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষকতা কিম্বা শাস্ত্রচর্চা করতেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন উদার ও মহানুভব।

রাজ্যের জনগণের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। কিন্তু বেশ কিছু বৌদ্ধ ও জৈন এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। রাজ্যে শতাধিক হিন্দু মন্দির ও মঠ ছিল। কিন্তু কাশী শহরে তার মাত্র গুটিবিশেক, বাকিগুলো চারিদিকের গ্রামে-গঞ্জে। এই শতাধিক মঠ ও মন্দিরে হাজার দশেক সাধু-সন্ন্যাসী সেবক ও পূজারী স্থায়ীভাবে বাস করতেন।

য়ুয়ান চোয়াঙের সময় কাশীরাজ্যে তিরিশটির মতো বৌদ্ধবিহার ছিল। এই বিহারগুলি ছিল প্রায় তিনহাজার বৌদ্ধভিক্ষুর স্থায়ী আবাস। সবচেয়ে বড় কথা রাজ্যের হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনগণ সর্বদা মিলে মিশে বসবাস করতেন।

য়ুয়ান চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকের বিবরণ। কিন্তু তারপরেও পাঁচশ বছর ধরে কাশীর ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কখনও প্রেম ও সম্প্রীতির অভাব দেখা দেয় নি এবং কাশী যুগে যুগে আরও উন্নত হয়ে উঠেছে। এই উন্নতির সাময়িক অবসান হয় দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে। মহম্মদ ঘুরী এই আনন্দনগরীকে নিরানন্দ পুরীতে পরিণত করেন।

কিন্তু ধ্বংসের কথা থাক, সৃষ্টির কথাই ভাবা যাক। য়ুয়ান চোয়াঙের সময় সেই কাশীরাজ্য ও কাশীনগর ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল?

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মোটামুটিভাবে বর্তমানের বানারস জেলাই সেকালের কাশীরাজ্য। কিন্তু তখনকার কাশীনগর বর্তমান কাশী শহরের মাইল দুয়েক উত্তরে অবস্থিত ছিল।

* লেখকের 'লাদাখের পথে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

এবারে একটু কাশীরাজ্যের রাজাদের কথা ভাবা যাক। কাশীর রাজবংশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তবে বেদ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে পুরাকালের কয়েকজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে রাজা দিবোদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অতিশয় শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৈহয় বংশীয় দুর্দম তাঁকে পরাজিত করেন।

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। প্রতর্দনের বংশধরগণ অর্থাৎ কশবংশীয় রাজারা বহুকাল কাশীতে রাজত্ব করেন। মৎস্যপুরাণে চব্বিশজন কশরাজার নাম রয়েছে। চতুর্দশ রাজা ধৃষ্টকেতু কুরুক্ষেত্রের (মহাভারত) যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

পরবর্তীকালের খ্যাতিমান কাশীরাজদের মধ্যে ধন্বন্তরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজপুত্র হয়েও তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে একটা যুক্তিসম্মত গ্রহণীয় রূপ দান করেন।

বুদ্ধদেব যখন কাশীতে আসেন, তখন কাশীর রাজা ছিলেন শিশুনাগের পুত্র যশ। তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কাশীরাজ্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের অধীনে আসে। সম্রাট অশোকের সময়ও কাশী মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজা হর্ষবর্ধন কাশীর রাজা ছিলেন। তারপরে কিছুকাল কাশী আবার মগধের অধীন হয়। অষ্টম শতকে কনৌজের রাজা যশোবর্মা কাশী অধিকার করেন।

একাদশ শতকে কাশী কিছুকাল গৌড়ের পাল রাজাদের অধীনে আসে। সেইসময় মহারাজ মহীপাল (১০২৭ খ্রীঃ) সারনাথের বৌদ্ধ স্তূপটির সংস্কার সাধন করেন। তারপরে আবার কনৌজ কাশী অধিকার করে। অবশেষে দ্বাদশ শতকে কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করে মুহম্মদ ঘুরী কাশী লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন।

কিন্তু সেকথা আর নয়। কারণ আগেই বলেছি, ঘুরী থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ ১১৯৪ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীর ইতিহাস অত্যাচার আর অবিচারের ইতিহাস, লুণ্ঠন আর ধর্ষণের ইতিহাস।

অতএব একেবারে অষ্টাদশ শতকের কথায় আসা যাক। ১৭৩০ সালে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ ব্রাহ্মণদলপতি ও গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারামকে রাজা উপাধি দান করে কাশীর রাজা মনোনীত করেন।

১৭৪০ সালে মনসারামের ছেলে বলবন্ত সিং কাশীর রাজা হন। ১৭৪৮ সালে মহম্মদ শাহ্ মারা যান, তাঁর ছেলে আহম্মদ শাহ্ দিল্লীর মসনদে বসেন। তিনি জনৈক সফদরজঙ্গকে অযোধ্যা প্রদেশের সুবেদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু বলবন্ত সুবেদারের অধীনতা স্বীকার করতে অসম্মত হন। তিনি রামনগরে দুর্গ নির্মাণ করেন।

১৭৫৩ সালে সফদরজঙ্গের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার সুবেদার হলেন। বলবন্ত তাঁকেও সুবেদারের স্বীকৃতি দিলেন না।

১৭৬৪ সালে দিল্লীর বাদশাহ বারাণসী রাজ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে দান করলেন। তাঁরা কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে দু-বছর বাদেই আবার রাজ্যটি সুজাউদ্দৌলাকেই ছেড়ে

দিলেন। কিন্তু সুচতুর বলবন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করে তাঁদের মিত্র-রাজা রূপে নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

১৭৭০ সালের ২২শে অগাস্ট রামনগর প্রাসাদে বলবন্তের মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে তিনি এক দাসীর গর্ভজাত তাঁর পুত্র চেৎ সিং-কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে গেলন।

চেৎ সিং রাজা হবার পরে বছর চারেক শান্তিতেই কাটে। কিন্তু ১৭৭৫ সালে সহসা ইংরেজরা বারাণসীর ওপরে তাঁদের অধিকার ঘোষণা করলেন। বলবন্তের সুযোগ্য সন্তান চেৎ সিং কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। আপন বুদ্ধিবলে তিনি ১৭৭৬ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে রাজসনদ আদায় করে নিলেন।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। রাজস্ব নিয়ে গোলমাল বাধল এবং ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল।

অবিশ্বাস্য সাহস ও বুদ্ধিবলে অনেক কম শক্তি নিয়েও তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-কে পরাজিত করলেন। চুনার দুর্গে পালিয়ে গিয়ে হেস্টিংস সেবারে কোনমতে প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

অপমানিত ওয়ারেন হেস্টিংস বহুগুণ শক্তি বৃদ্ধি করে আবার রামনগর আক্রমণ করলেন। প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে চেৎ সিং হেস্টিংস-কে বাধা দিলেন। কিন্তু সেই অসমযুদ্ধে তাঁর পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হল না। তাই বলে হেস্টিংস তাঁকে বন্দী করতে পারলেন না। দুঃসাহসিকভাবে পালিয়ে গোয়ালিয়র চলে গেলেন। সেখানেই ১৮১০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭৮১ সালে হেস্টিংস বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বেনারস রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে জমিদারী সনদ প্রদান করলেন।

১৭৯৫ সালে তিনি মারা যাবার পরে তাঁর ছেলে উদিতনারায়ণ রাজা হলেন। কিন্তু কোন কারণে ১৮০৫ সালে মহীপনারায়ণের ভাইপো ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ বাহাদুর রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার তাঁকে G.C.S.I. উপাধিতে ভূষিত করে তেবোটি তোপের সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধরগণই 'কাশীনরেশ' বলে খ্যাত হন।...

কিন্তু তাঁদের কথা আর নয়। তাছাড়া আর সময়ও নেই। আমাদের টাঙ্গা হোটেল যমুনার সামনে এসে থেমেছে। সাবধানে টাঙ্গা থেকে নেমে আসি।

।। তেরো ।।

ঘোড়ায় চড়লে গা-ব্যথা হয় জানি, টাঙ্গা ঘোড়ায় টানে তাও জানি। কিন্তু টাঙ্গায় চাপলেও যে গা-ব্যথা হয়, সে খবর জানা ছিল না এতকাল। আজ জানা গেল। টাঙ্গায় চেপে নিশ্চয়ই ওদের গা-ব্যথা হয়েছে। নইলে আজ ওদের এমন অমৃতে অরুচি হবে কেন?

ওরা আজ সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ গলিতে গিয়ে কেনাকাটা না করে হোটেলের ঘরে বসে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে আমার গল্প শুনছে। আজও আমি কাশীখণ্ডের গল্প বলছি। বলছি রাজা দিবোদাসেরর কাহিনী।

ভক্তবৎসল বিশ্বনাথ প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুরোধে সপরিবারে কাশী ছেড়ে কুশদ্বীপে চলে গেলেন। সেখানে মন্দার পর্বতশিখরে বাস করতে থাকলেন। যাবার সময় ব্রহ্মার সুপারিশে তিনি দিবোদাসকে কাশীরাজ্য দান করে গেলেন।

দিবোদাস দিব্যশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ও চতুর। তিনি অগ্নি বায়ু ও বরুণকে সৃষ্টি করে সুদীর্ঘকাল কাশীতে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল কোনমতেই নিষ্কণ্টক নয়। কারণ কিছুকাল পরেই কাশীশ্বর আনন্দকানন কাশীতে ফিরে আসার জন্য আকুল হয়ে পড়লেন। দান করেও বিশ্বনাথ কাশী ফিরে পেতে চাইলেন।

রাজী হলেন না রাজা দিবোদাস। রেগে গেলেন বাবা বিশ্বনাথ। দিবোদাসকে কাশী থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি প্রথমে যোগিনীদের ও পরে সূর্যদেবকে কাশী পাঠালেন।

তাঁরা কিন্তু কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হলেন। কারণ কাশীতে এসে কাশীর সৌন্দর্য দেখে তাঁরা এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে কাজের কথা আর মনেই পড়ল না। তাঁরা মনের আনন্দে আনন্দকানন কাশীতে বাস করতে থাকলেন।

বাধ্য হয়ে শিব ব্রহ্মাকে বললেন—তোমার পরামর্শে আমি দিবোদাসকে কাশী দান করেছিলাম। কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি যে আমি ফিরে চাইলেও সে আমার কাশী আমাকে ফিরিয়ে দেবে না। এখন আমার মন কাশীতে ফিরে যেতে চাইছে। তুমি দিবোদাসকে তাড়িয়ে আমার কাশী আমাকে ফিরিয়ে দাও।

এ ব্যাপারে শিবকে সাহায্য করা ব্রহ্মার নৈতিক দায়িত্ব। অতএব তিনি বিশ্বেশ্বরের আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে ব্রহ্মা দিবোদাসের রাজসভায় এলেন। রাজাকে বললেন—আমি কাশীর গঙ্গাতীরে পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাই। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও।

ধর্মপ্রাণ রাজা সানন্দে ব্যবস্থা করলেন। ব্রহ্মার বাসনা পূর্ণ হল। সেই থেকে ঐ পবিত্র যজ্ঞস্থলের নাম হল দশাশ্বমেধ—দশাশ্বমেধ ঘাট। তোমরা সবাই সে ঘাটে গিয়েছো।

ছেলে-মেয়ে বাবা-মা সবাই মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি—তারপরে ব্রহ্মা বেশ কয়েকদিন কাশীতে বাস করলেন।

কিন্তু তিনি দিবোদাসের কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। উপরন্তু তাঁর ধর্মবোধ ভক্তি প্রজ্ঞা ও দানশীলতায় বার বার মুগ্ধ হলেন। এ অবস্থায় এই পুণ্যবান প্রজাপালককে কেমন করে তিনি পুণ্যভূমি কাশী থেকে তাড়িয়ে দেন? অতএব বিফল ব্রহ্মা নিজেই কাশী থেকে পালিয়ে গেলেন, সোজা ব্রহ্মলোকে পাড়ি দিলেন।

খবরটা বিশ্বেশ্বরের অজানা রইল না। তবু তিনি ব্রহ্মার বিফলতায় বিচলিত হলেন না। দিবোদাসকে তাড়াবার জন্য একের পর এক দেব-দেবীকে কাশী পাঠাতে থাকলেন। কিন্তু তাঁদের সবার একই হাল হোল। যিনি আসেন তিনিই কাশীর সৌন্দর্য আর দিবোদাসের সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে কাশীতেই বাস করতে থাকেন, আসল কাজের কথা কারও মনেই থাকে না।

অবশেষে বিরক্ত বিশ্বনাথ বাধ্য হয়ে পুত্র গজাননকে কাশী পাঠালেন। রাতে কাশীতে পৌঁছেই লম্বোদর কাশীবাসীদের ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখালেন। স্বপ্নের ঘোরে তাঁরা সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন, ভয়ে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠেও সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নকে স্মরণ করে তাঁরা বার বার আঁতকে উঠতে থাকলেন।

এদিকে পরদিন সকালে গণেশ গণকের রূপ নিয়ে কাশীর পথে পথে পদচারণা শুরু করলেন আর ঘরে গিয়ে কাশীবাসীদের কাছে আগের রাতের স্বপ্নটার খুব খারাপ অর্থ ব্যাখ্যা করে তাঁদের কাশী থেকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন।

পরদিন রাতে গজানন মায়াবলে রাজা দিবোদাসকে স্বপ্ন দেখালেন—রাজলক্ষ্মী তাঁকে ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে কাশী থেকে চলে যাচ্ছেন। আর তারপরেই কাশীধামের ধ্বজাদণ্ড ভেঙ্গে ধ্বজাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাজা ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর তিনি জেগে উঠেই খবর পেলেন, সত্যই পতাকাদণ্ডটি ভেঙ্গে রাজপতাকা মাটিতে লোটাচ্ছে। ব্যাকুল রাজা দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন।

স্বামীর অবস্থা দেখে রাণী লীলাবতী বড়ই বিচলিতা হলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—শুনেছি আমাদের এই নগরে এক দিব্যজ্ঞানী বিদেশী গণক এসেছেন। তাঁকে রাজসভায় ডেকে এনে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করুন।

সর্বদর্শী শিব সবই দেখতে পেলেন। পুত্রের সাফল্যে পিতা পুলকিত হয়ে উঠলেন।

লীলাবতীর পরামর্শে পরদিন দিবোদাস গণকরূপী গণেশকে আমন্ত্রণ জানালেন। ছদ্মবেশী গজানন রাজসভায় এলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—আজ থেকে আঠার দিনের মধ্যে একজন সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আপনার কাছে আসবেন। কেবল তিনিই আপনার সকল সংশয় দূর করতে পারবেন। তবে তিনি যা আদেশ করেন, আপনাকে তা পালন করতে হবে।

দিবোদাস সম্মত হলেন। তারপরে তিনি হাতজোড় করে ব্রাহ্মণকে বললেন—দ্বিজবর! আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু কামনা করেন, আমি তা পূর্ণ করে ধন্য হবো।

—আপনি তাহলে আপনার রাজধানীতে আমাকে ভূমি দান করুন। কারণ আমার পিতৃদেব এখানে বাস করতে চাইছেন।

মহামতি দিবোদাস পুলকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—এ তো খুবই ভাল কথা বেশ, আজই আমি আপনাকে এই পঞ্চক্রোশী কাশীধাম অর্পণ করলাম।

এত সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা সিদ্ধিদাতা নিজেও বুঝতে পারেন নি। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে তিনি সর্ববিঘ্নবিনাশক বিশ্বনাথের জন্য কাশীতে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সেই সঙ্গে ছাপ্পান্ন জন গণেশ সৃষ্টি করে কাশীধামকে রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে তিনি নিজে ঢুণ্ডিরাজ নামে পরিচিত হলেন।

পূজারীরা বলেন, যাঁরা ঢুণ্ডিরাজ গণেশকে তিলের লাড্ডুসহ পুজো দেন, তাঁদের কামনা কখনো অপূর্ণ থাকে না। আর তাই কাশীতে এসে প্রথমেই তাঁর পুজো করে নিতে হয়।

—তারপরে বুঝি রাজা দিবোদাস কাশী থেকে চলে গেলেন আর বিশ্বনাথ কাশী ফিরে এলেন?

অপুর প্রশ্নে একবার থামতে হয় আমাকে। তারপরে উত্তর দিই—হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। তবে সেকথা বলার আগে আরেকটি গল্প বলতে হবে।

—ইস কি মজা! আরেকটি গল্পের গন্ধ পেয়ে বাবলা আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে।

—বাবলি জিজ্ঞেস করে—কি গল্প জেঠু?

—আদিকেশব শিবলিঙ্গ ও কুমুদী উপাখ্যান।

—তুমি বলো জেঠু! বাবু তাগিদ লাগায়। ওর বোধ হয় আর তর সইছে না।

আমি শুরু করি—এদিকে গণেশ ফিরে আসতে দেরি করছেন দেখে, বিশ্বনাথ পুনরায় অস্থির হয়ে পড়লেন। এবারে তিনি স্বয়ং নারায়ণকে কাশীধামে পাঠালেন। নারায়ণ কাশীতে এসেই বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমে আদিকেশব নামে নিজমূর্তি স্থাপন করে সেখানে স্থির হলেন। তারপরে তিনি নিজেই পুজো করলেন।....

—আমরা গতকাল যে আদিকেশব দর্শন করে এলাম!

মাথা নেড়ে সুধাংশুর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলতে থাকি—ভগবানের অজ্ঞাতে ভগবতী কমলাও বরুণা সঙ্গমে উপস্থিত হলেন। তিনিও সেখানে আত্মমূর্তি স্থাপন করে নিজের পুজো করলেন।

পরে ব্যাপারটা জানতে পেরেও নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে কিছুই বললেন না। বরং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মতীর্থে এলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধদেবের রূপ ধারণ করে পূর্ণকীর্তি নাম গ্রহণ করলেন। আর লক্ষ্মীদেবীর নাম রাখলেন বিজ্ঞানকুমুদী। সেই ধর্মতীর্থের নতুন নাম হোল বিনয়কীর্তি।

বুদ্ধরূপী সনাতন ভগবান তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু করে দিলেন এবং প্রিয়তমা বিজ্ঞানকুমুদীকে বৌদ্ধমত প্রচারের জন্য গৃহস্থদের অন্তঃপুরে পাঠালেন।

তাঁদের প্রচারে কাশীবাসীরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁরা আস্তিকতা ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেলেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানকুমুদী মেয়েমহলে বৌদ্ধমত প্রচার করে তাঁদের তিলকঅঞ্জন ও বশীকরণ দান করলেন। ফলে কাশীর কুলবধূরা পতিব্রতা ধর্ম বিসর্জন দিয়ে কুলটা হয়ে গেল।

রাজা দিবোদাস প্রজাদের অধর্মে মতি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর সেই গণকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি চিন্তিত হয়ে ভগবানকে স্মরণ করলেন।

ভক্তের ডাক শুনে ভগবান স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে এলেন দিবোদাসের কাছে। তাঁর সবকথা শুনলেন। তারপরে বললেন—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, প্রজাদের পাপে মতি হয়।

—দয়াময়! আমি এমন কি পাপ করেছি যার জন্য প্রজাদের পাপে মতি হল?

—দিবোদাস, তুমি বিশ্বেশ্বরকে তাঁর পরমপ্রিয় আনন্দকানন কাশী থেকে নির্বাসিত করেছো। অথচ তুমিও জানো যে কাশীনাথ কাশীকে কতখানি ভালোবাসেন। তুমি কাশীতে রাজত্ব করছ আর কাশীশ্বর কুশদ্বীপে বসে 'হা কাশী, হা কাশী' বলে বিলাপ করছেন।

—দয়াময়! এখন আমার পক্ষে এ অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি?

—কাশীধামে তুমি নিজে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করো।

ভগবানের আদেশে দিবোদাস একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। দিবোদাসের প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিঙ্গের নাম হল ভূপালেশ্বর। এবং বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি পাপমুক্ত হলেন।

তারপরেই কাশীনাথের করুণায় রাজা দিবোদাস ও রাণী লীলাবতী শিবত্ব লাভ কবে সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।

বলা বাহুল্য দিবোদাস স্বর্গবাসী হবার পবে কাশী বিশ্বনাথ আবার কাশীতে ফিরে এলেন। সেই থেকেই তিনি কাশীতে রয়েছেন। থাকবেন চিরদিন।

—কিন্তু জেঠু, সেদিন তুমি বলেছিলে, কাশীব পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার কপিলধারা তীর্থে আমাদের একদিন নিয়ে যাবে, কারণ রাজা দিবোদাসের কাশী থেকে চলে যাওয়া আর বিশ্বনাথের কাশীতে ফিবে আসাব সঙ্গে নাকি সেই তীর্থের সম্পর্ক রয়েছে। আজ তো তুমি কপিলধারার কথা কিছুই বললে না!

আমি থামতেই অপু সবিস্ময়ে বলে উঠল। আরেকটা গল্প বলতে হয় বলে আমি আর কপিলধারার নাম করি নি। কিন্তু সাধ্য কি এদের ফাঁকি দিই! তাই একটু হেসে বলি—বেশ, এখন কপিলধাবা তীর্থেব কথা বলছি।

ওরা সবাই ঠিক হয়ে বসে। আমি শুরু কবি—

তোমাদের বলেছি যে কাশীব বিবহে কাতব হয়ে বিশ্বনাথ মন্দার পর্বতে দিন-রাত কান্নাকাটি করছিলেন, 'হা কাশী হা কাশী' বলে প্রলাপ বকছিলেন।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—শুধু তাই নয়, তিনি মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দিবোদাসকে রাজি কবিযেই ভগবান তাঁব বাহন গরুড়কে মন্দার পর্বতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিনতানন্দন গরুড় তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন মন্দাবশিখরে। কাশীর বিরহে কাতর গঙ্গাধরকে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন—প্রভু, আপনি শান্ত হোন। দিবোদাস সম্মত হয়েছেন। তিনি কাশী পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। এখন আপনি চলুন, গিয়ে কাশীধাম রক্ষা করুন।

বিশ্বনাথ বড়ই আনন্দিত হলেন। গরুড়কে আশীর্বাদ কবে তিনি অন্নপূর্ণাকে সুসংবাদ দিলেন। তারপরে হর-পার্বতী নন্দীর পিঠে উঠে বসলেন। ভৃঙ্গী ও অন্যান্য শিবানুচর ভূত-প্রেতগণ তাঁদের অনুসরণ করলেন।

গরুড় তাড়াতাড়ি কাশীতে ফিরে এসে বিষ্ণুকে খবর দিলেন। শিবকে স্বাগত জানাবার জন্য নারায়ণ এগিয়ে চললেন।

কাশীনাথ কাশীতে ফিরে আসছেন। সুসংবাদটি চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। কাশীর আকাশে বাতাসে আর মাটিতে আনন্দের প্লাবন বইতে শুরু করল। গঙ্গার বুকে জোয়ার এলো। ভ্রমর গুঞ্জন করে বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করতে থাকল, কোকিল পঞ্চম স্বরে ভবানীপতির আগমন-বার্তা ঘোষণা করে উঠল। সারা জীবজগৎ মঙ্গলময়ের আগমন সংবাদে আনন্দিত হয়ে প্রেমভরে নাচতে শুরু করে দিল। ফুলের সৌরভে বুক ভরে নিয়ে মলয় বাতাস বইতে থাকল। দেব-দানব ও যক্ষগণ মহাদেবের মহিমা কীর্তন আরম্ভ করলেন। এক কথায় সমস্ত বিশ্বচরাচর বিশ্বেশ্বরের স্তবগান করতে থাকলেন।

কাশীর পূর্বদ্বারে বিষ্ণু বিশ্বনাথকে স্বাগত জানালেন। আনন্দকানন কাশীতে প্রবেশ করার আগে মহাকাল মহাদেব জগৎপালক বিষ্ণুকে দেখে বড়ই আনন্দিত হলেন। তাড়াতাড়ি বৃষ থেকে নেমে ছুটে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আলিঙ্গনমুক্ত হবার পরে শিব দেখতে পেলেন যোগিনীরা ম্লানমুখে মাথা নিচু করে পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই আনন্দযজ্ঞে যেন তাঁদের কোন অধিকার নেই। ভূতেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর আদেশ পালন করতে না পারার জন্যই তাঁরা এমন ম্লানমুখী হয়ে রয়েছেন।

তিনি তাই তাঁদের কাছে এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে বললেন—তোমরা আমার আদেশ পালন করতে পারো নি, কিন্তু আনন্দকানন কাশীকে ভালোবেসে কাশীতে রয়ে গিয়েছো। যারা কাশীকে ভালোবাসে, আমি তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করি। তোমাদেরও ক্ষমা করলাম।

উমাকে নিয়ে উমাপতি আনন্দকাননে ফিরে আসায় আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে গেল। নন্দা ও সুনন্দা প্রভৃতি অষ্ট কপিলা স্বর্গ থেকে সেই আনন্দ-উৎসব দেখতে এলেন। দেখতে দেখতে তাঁরাও আনন্দময়ী হয়ে উঠলেন। সেই আনন্দসাগরে ভাসতে ভাসতে আনন্দমগ্না কপিলাদের পয়োধর হতে নিজের থেকে ক্ষীরধারা ঝরতে শুরু করল। যোগিনী ও ভক্তগণ সেই ক্ষীর দিয়ে ভূতেশ্বরকে অভিষিক্ত করলেন।

সেই ক্ষীর ঝরে ঝরে সেখানে এক সরোবর সৃষ্ট হল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুসহ সব দেব-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে শিব সেই সরোবরে অবগাহন করলেন। তারপরে বললেন—আজ থেকে আমি এই সরোবরের নাম রাখলাম কপিলধারা অথবা শিবগয়া। সোমবার যদি অমাবস্যা হয়, তাহলে সেদিন তোমরা এই সরোবরে স্নান করে এখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ক'রো, গয়াতে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানের ফললাভ করবে।

অবশেষে বিশ্বনাথ দেব-দানব মানুষ যক্ষ-যোগিনী এবং পশু-পাখিদের সঙ্গে নিয়ে কাশীধামে প্রবেশ করলেন। কাশীনাথ কাশীতে ফিরে এলেন। কাশী আবার শিবালয় হয়ে উঠল।

॥ চোদ্দ ॥

আজ সোমবার। আজ আমরা বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার পুজো দেব। তাই সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়ে গামছা আর জামা-কাপড় নিয়ে চলে এসেছি দশাশ্বমেধ ঘাটে। নৌকো করে গঙ্গার অপরপারে পৌঁচেছি। এপারে ঘাট নেই কিন্তু পরিষ্কার টলটলে জল। আরামে গঙ্গাস্নান সেরেছি। কাশীর দিকে বিশেষ করে দশাশ্বমেধে জল পরিষ্কার নয় বলে অনেকেই এখন এমনি এপারে এসে গঙ্গাস্নান সেরে নেন।

স্নান সেরে মন্দিরে এলাম—বিশ্বনাথ মন্দিরে। রামচন্দ্রজী দাঁড়িয়ে আছেন তোরণের সামনে। তিনি দোকান দেখিয়ে দিলেন। ভিজে জামা-কাপড় ও জুতো সেখানে রেখে হাত ধুয়ে আমরা ফুল ও মিষ্টির ডালি নিই। তারপরে তোরণ পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি।

তোরণের বাঁদিকে একটু উঁচুতে লক্ষ্মী-মাধবের মন্দির। শৃঙ্গারের পরে বাবা বিশ্বনাথের জিনিসপত্র এখানে জমা থাকে। আমরা দর্শন করি।

আজ সোমবার। এরই মধ্যে মন্দিরে বেশ ভিড় হয়ে গেছে। তাহলেও রামচন্দ্রজীর ব্যবস্থাপনায় পুজো দিতে আমাদের তেমন একটা অসুবিধে হল না।

পুজোশেষে পশ্চিমের দরজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। চাতালের মাঝখানে একটি লিঙ্গমূর্তি দেখিয়ে পাণ্ডাজী বলেন—বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেব। বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর দিন এখানে বিশেষ পুজো হয়। মেয়েরা সেদিন ব্রতপালন করেন।

বৈকুণ্ঠেশ্বরের পশ্চিমে বিশ্বনাথ মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে একটি পৃথক মন্দির দেখিয়ে রামচন্দ্রজী বলেন—দণ্ডপাণিশ্বর মহাদেব।

প্রণাম করি। তারপরে কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে খানিকটা নেমে আসি। পাণ্ডাজীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ছোট মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। রামচন্দ্রজী বলেন—রাণী অহল্যাবাঈ।

অষ্টধাতুর মূর্তি। হাতজোড় করে বসে আছেন। আমরা দর্শন করি, প্রণাম করি।

পাণ্ডাজী আবার বলেন—পুণ্যবতী মহারাণী অহল্যাবাঈকে আমরা পার্বতী জ্ঞানে পুজো করি।

ঠিকই করেন, মনে মনে ভাবি। কিন্তু সেকথা না বলে রামচন্দ্রজীর সঙ্গে এগিয়ে চলি। বিশ্বনাথ মন্দিরের উত্তর-পূর্বে একটি ছোট মন্দিরের সামনে আসি। কালো পাথরের ভোগ-অন্নপূর্ণা ও আনন্দ-ভৈরবের মন্দির। আমরা দর্শন করি।

তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়াই। রামচন্দ্রজী বলেন—প্রণাম করুন, কাশীধামের প্রচীনতম মূর্তি।

প্রণামের পরেও কিছুক্ষণ ধরে ওরা মূর্তিটিকে দর্শন করে। বোধকরি সেদিন অবিমুক্তেশ্বরের কথা বলেছিলাম বলে।

রামচন্দ্রজীর জানা নেই সেকথা। তাই তিনি তাগিদ দেন—চলুন, এবারে জ্ঞানবাপী দর্শন করবেন।

—কিন্তু তার আগে একটু বিশ্বনাথ মন্দিরের কথা বলে নেবেন না! টুকু আবদার করে।

রামচন্দ্রজী তাড়াতাড়ি জবাব দেন—বলব বৈকি মা, নিশ্চয় বলব। চলো, ওখানে গিয়ে একটু বসা যাক।

আমরা নাটমন্দিরের এককোণে এসে বসি। রামচন্দ্রজী বলতে শুরু করেন—এটি বাবা বিশ্বনাথের তৃতীয় মন্দির। আগের মন্দিরটি ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করার পরে নারায়ণ ভট্ট নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ, পাণ্ডা ও পূজারীদের সহায়তায় এখানে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করেন। কথিত আছে জ্ঞানবাপী থেকে বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্তি উদ্ধার করে প্রথমে সেই কুটিরের এককোণে রাখা হয়। পরে তাঁকে তুলে এনে আর মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। আজও তিনি মন্দিরের এককোণে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনারা দর্শন করে এলেন।

আমরা মাথা নাড়ি। পাণ্ডাজী পুনরায় বলেন—ষাট বছরের বেশি সময় ধরে সেই কুটিরেই বাবা বিশ্বনাথের পূজা হয়। তারপরে ১৭২১ সালে পেশওয়া বাজীরাও পাকা মন্দির তৈরি করে দেন।

১৭৬৪ সালে মহারাণী অহল্যাবাঈ সেই জায়গাটিতেই এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ৫১ ফুট উঁচু কিন্তু লম্বায় মাত্র ৩৫ ফুট। এর নির্মাণ-কৌশল একটু বিচিত্র ধরনের।

—কি রকম? ধীরেন জিজ্ঞেস করে।

—সাধারণতঃ মন্দিরের সামনে থাকে নাটমন্দির। এখানে নাটমন্দিরটিকে মাঝখানে রেখে দু-দিকে দুটি মন্দির তৈরি কবা হয়েছে। দুটি মন্দির একই রকম। কেবল বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াটি বেশি উঁচু এবং কারুকার্যমণ্ডিত। মন্দিরের ওপরে তো বটেই নাটমন্দিরের ওপরেও গোলাকাব গম্বুজ রয়েছে।

পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরেরব চূড়া সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কর্মচারীর ওপরে তিনি এই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, সে তামার পাতের ওপর সোনার জল দিয়ে কাজটা সেরে উদ্বৃত্ত টাকায় অসিসঙ্গমে নিজের জন্য একখানি বাড়ি করে নেয়। তাহলেও সবাই, বিশেষ করে বিদেশীরা বিশ্বনাথ মন্দিরকে আজও 'Golden Temple' বলেন।

থামলেন পাণ্ডাজী। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপবে বললেন—চলুন, এবারে জ্ঞানবাপী দর্শন করে মা-অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাওয়া যাক।

কিন্তু উঠতে গিয়ে বাধা পাই। মনোরঞ্জন বলে—এ মন্দিরে তো অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। তাহলে কি তাঁদের, বিশেষ করে বিদেশীদের মন্দির দর্শনের কোনো ব্যবস্থা নেই?

—আছে। নহবৎখানার ঠিক উল্টোদিকে একটা ঝুলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁরা দর্শন করতে পারেন। সেখান থেকে সারা মন্দির এলাকাই চমৎকার দেখা যায়।

আবার একবার থামলেন পাণ্ডাজী। তাবপরে বলেন—এখন তাহলে চলুন, জ্ঞানবাপী যাওয়া যাক।

উঠে দাঁড়াই। পাণ্ডাজী চলতে শুরু করেন। তাঁকে অনুসরণ করি। মন্দিরের পেছনে

অর্থাৎ উত্তরদিকে আসি। এখানে একফালি দরদালান। অসংখ্য শিবলিঙ্গ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

—বাবা! এত শিবলিঙ্গ! সবিস্ময়ে অপু বলে ওঠে।

বিস্মিত হবারই কথা। কিন্তু সত্যি কি তাই?

না। অপুর দিকে ফিরে একটু হেসে বলি—কাশীতে সর্বত্র, কি গঙ্গাতীরে কি শহরের অলিতে-গলিতে, তুমি পথ চলতে গেলেই শিবলিঙ্গ দেখতে পাবে। বলা হয় যে কাশীতে এক লক্ষ শিবলিঙ্গ রয়েছে।

—এক লক্ষ!

—হ্যাঁ। আবার অনেকে বলেন, কাশী শহরটাই শিবলিঙ্গ দিয়ে তৈরি। কারণ কাশীতে পাথর মানেই শিবলিঙ্গ। কিন্তু সেকথা থাক। আমরা যাঁকে শিবলিঙ্গ বলি, তা দু-রকমের। এক রকম চলমূর্তি আরেক রকম অচলমূর্তি। যাঁদের যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়, তাঁরা চলমূর্তি। আর যাঁদের নড়ানো যায় না, তাঁরা অচলমূর্তি।

অচলমূর্তি দু-রকমের। একরকম যাঁদের মানুষ তৈরি করেছেন, আরেক রকম যাঁরা নিজেরাই প্রকট হয়েছেন। এঁদের বলা হয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ।

মানুষের তৈরি মূর্তিগুলো তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার নামে পরিচিত। আর স্বয়ং শিবই স্বয়ম্ভু মূর্তিদের নাম রেখেছেন। সারা ভারতে ৬৮টি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ রয়েছেন। এবং একটু আগে আমরা যাঁকে দেখে এলাম, সেই বাবা বিশ্বনাথ তাঁদেরই একজন।

এখানে যেসব মূর্তি দেখছ, এঁরা কেউ স্বয়ম্ভু নন। কাশীর বিভিন্ন জায়গায় অযত্নে পড়ে থাকা কিছু লিঙ্গমূর্তি এখানে এনে রাখা হয়েছে। এ জায়গাটাকে বলে শিবের কাছারী বা শিবের দরবার।

—শিবের লিঙ্গমূর্তি সম্পর্কে আরেকটা কথা কিন্তু বললেন না মহারাজদা!

পাণ্ডাজীর প্রশ্ন শুনে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার বলেন—আপনি কিন্তু জ্যোতির্লিঙ্গ মানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের কথা কিছুই বললেন না।

ব্যাপারটা ভাল করে জানা নেই আমার। তাই পরিত্রাণ পাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে ফেলি—আপনি বলুন।

না, আপত্তি করেন না রামচন্দ্রজী। বরং বলতে আরম্ভ করেন—আপনারা জানেন, তীর্থময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছেন। তাঁর একজন হলেন বাবা বিশ্বেশ্বর, যাঁকে এইমাত্র আপনারা দর্শন করে এলেন।

আমরা মাথা নাড়ি। পাণ্ডাজী বলতে থাকেন—বাকি অধিকাংশেরই প্রতিনিধি লিঙ্গমূর্তি রয়েছেন এখানে, এই পবিত্র কাশীক্ষেত্রে। তাই কাশী ভারতের সর্বোত্তম তীর্থ।

—যেমন? সুধাংশু প্রশ্ন করে।

পাণ্ডাজী উত্তর দেন—যেমন সোমনাথের সোমেশ্বর রয়েছেন মানমন্দির ঘাটে। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর আছেন বৃদ্ধকালেশ্বর প্রাঙ্গণে। দেওঘরের বৈদ্যনাথ রয়েছেন কামাচ্ছা অঞ্চলে। মহারাষ্ট্রের ভীমশঙ্কর আছেন কচৌরি গলিতে, প্রায় বিশফুট মাটির তলায়।

—তাঁর কাছে যাওয়া যায়? মনোরঞ্জন বলে ওঠে।

—যায় বৈকি! যাবার জন্য একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। তাছাড়া তাঁকে মাটির ওপর থেকেও দর্শন করা যায়।

একবার একটু থামেন পাণ্ডাজী। তারপরে আবার বলেন—কাশীর কেদারনাথজীকে তো আপনারা দর্শন করেছেন। নর্মদাক্ষেত্রের ওঙ্কারনাথজীও রয়েছেন এখানে। আর এইসব জ্যোতির্লিঙ্গের পুণ্যজ্যোতিতে পঞ্চক্রোশী কাশীধাম সর্বদা স্বর্গালোকিত।

কাছারী ছাড়িয়ে মুক্তিমণ্ডপ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল পাথরের চৌকো ছাউনী।

পাণ্ডাজী বলেন—চল্লিশটা পাথরের থামের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপের ছাদ। প্রত্যেক দিকে দশটি করে থাম। তাকিয়ে দেখুন থামগুলোর গায়ে কি চমৎকার খোদাইকাজ।

অমারা দেখি। রামচন্দ্রজী আবার বলেন—আর ঐ দেখুন, উত্তরদিকের দ্বিতীয় বিশ্বনাথ মন্দিরের একাংশের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরটি চুনার পাথর দিয়ে তৈরি ছিল।

ধ্বংসস্তূপের কি দেখব? তবু একবার সেদিকে তাকাই। তারপরে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করে—এই মুক্তিমণ্ডপ কে কবে তৈরি করে দিয়েছেন?

পাণ্ডাজী বলেন—১৮২৮ সালে গোয়ালিয়ারের মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা স্ত্রী মহারাণী বৈজাবাঈ জ্ঞানবাপী দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য এই মণ্ডপ তৈরি করেন। সেকালে তো বটেই, একালেও বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে ক্লান্ত যাত্রীরা এখানে এসে জ্ঞানবাপীর পুণ্যবারি পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চান। কারণ জ্ঞানবাপী কাশীক্ষেত্রের প্রাচীনতম তীর্থ। ক্লান্ত যাত্রীদের জন্যই মহারাণী এই পাথরের ছাউনী তৈরি করে দিয়েছেন।

এই ছাউনীর একদিকে বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দির, আরেকদিকে ঐ দেখুন আওরঙ্গজেবের মসজিদ।....

আমরা দেখি। মিনার দুটি বেশ উঁচু। দুটি গোলাকার গম্বুজও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বেশ বড় মসজিদ। স্থাপত্যশৈলীও ভাল।

তা তো হবেই। ভারতসম্রাট তৈরি করেছেন। তার ওপর পাথর-টাথর সবই তো পাওয়া গিয়েছে।...

পাণ্ডাজী বলছেন—সম্রাট আকবরের আমলে তৈরি বৃহত্তম বিশ্বনাথ মন্দির ওখানেই অবস্থিত ছিল। সেই মন্দির ভেঙ্গে তারই পাথর দিয়ে ঐ মসজিদ তৈরি হয়েছে।....

পাণ্ডাজীর কথা শুনে কথাটা মনে পড়ে যায় আমার। কাশীর ওপরে একালের প্রখ্যাত গবেষিকা শ্রীমতী ডায়না লিখেছেন—'On the far side of the well (Jnana Vapi) from the temple is the great mosque of Aurangzeb, built upon the ruins of the grand sixteenth century Vishveshvara Temple. The mosque is the Muslim transformation of the old Hindu edifice. One wall of the old temple is still standing, set like a Hindu ornament in the matrix of the mosque.

কিন্তু মসজিদ নয়, জ্ঞানবাপী দর্শন করতে এসেছি। তাই পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই সেই পরম পবিত্র জ্ঞানকূপের ধারে। সুধাংশু জিজ্ঞেস করে—কুয়োটি কত গভীর?

---

* 'Banaras: City of Light' by Diana L. Eck., Pub. in 1983 (London)

পাণ্ডাজী উত্তর দেন—ঠিক বলতে পারব না। জল তোলার ঐ দড়িটা দেখুন।

আমরা দেখি, বিরাট লম্বা নাইলনের দড়ি। যিনি দড়ি বালতি দিয়ে জল তুলছেন পাণ্ডাজী হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন—জল এখন কত নিচে?

—পঞ্চান্ন ফুট।

—পঞ্চান্ন ফুট! আমার কয়েকজন সহযাত্রী সমস্বরে বলে ওঠে।

ওঁরা দুজনেই মাথা নাড়েন। আমি বলি—আর কুয়োর ওপরের এই ব্যাস?

—দশ ফুট। পাণ্ডাজী উত্তর দেন। বলেন—এই কুয়োর ভেতরে নামবার সিঁড়ি রয়েছে। কুয়ো পরিষ্কার করবার সময় শুধু সেই সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়।

—আচ্ছা, কুয়োর মুখে এমন কাপড় দিয়ে রেখেছেন কেন? টুকু জিজ্ঞেস করে।

—দেখছেন না ভক্তরা কেবলি জ্ঞানকূপকে ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দিচ্ছেন। এগুলো কুয়োয় পড়লে যে জল নষ্ট হয়ে যাবে! পুণ্যার্থীরা প্রায় প্রত্যেকেই এই পুণ্যবারি পান করেন। কারণ আমরা এই পুণ্যবারিকে বাবা বিশ্বনাথের চরণামৃত মনে করি।

একটু থেমে পাণ্ডাজী আবার বলেন—কুয়োর ওপরে কেবল কাপড় নয়, ঐ জল তোলার জায়গাটুকু বাদ দিয়ে কাপড়ের নিচে লোহার জাল দেওয়া রয়েছে।

—কেন? অর্চনা অবাক।

—যাতে কেউ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে না পারে।

—কেউ করেছে নাকি? এবার অঞ্জুর প্রশ্ন।

—বেশ কয়েকজন চেষ্টা করেছিলেন।

—কিন্তু কেন?

—তা তো জানি না। একটু হাসেন পাণ্ডাজী। তারপরে বলেন—নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

—আমরা জল খাবো না? সুধাংশু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

পাণ্ডাজী বলেন—খাবেন বৈকি! তবে ওখানে গিয়ে ওদের পেছনে লাইনে দাঁড়াতে হবে। সেবাইত যেমন জল তুলে এক একজনকে দিচ্ছেন, তেমনি আপনাদেরও জলদান করবেন।

আমরা পাণ্ডাজীর নির্দেশ পালন করি। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জল পেয়ে যাই। সেবাইত জল ঢেলে দেন, আমরা আঁজলা ভরে পান করি—পুণ্যতীর্থ জ্ঞানবাপীর শীতল ও সুমিষ্ট পবিত্রবারি।

—কিন্তু ঠাকুরমশায়, আপনি জ্ঞানবাপীর পুণ্যকাহিনী বললেন না! সহসা ধীরেন অভিযোগ পেশ করে।

রামচন্দ্রজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—বলব বৈকি। নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে শুনবেন কেমন করে? তার চেয়ে চলুন ঐ অক্ষয়বটের গোড়ায় গিয়ে বসা যাক।

অক্ষয়বট মানে জ্ঞানবাপীর পাশেই একটা সুবিশাল অশ্বত্থ গাছ। অনেকখানি উঁচুতে চমৎকার করে গোড়া বাঁধানো। ওপরে উঠতে অসুবিধে নেই কারণ কয়েকধাপ সিঁড়ি রয়েছে। তবে জুতো খুলতে হল। কারণ এখানেও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

লিঙ্গমূর্তিকে প্রণাম করে আমরা রামচন্দ্রজীকে ঘিরে বসি। তিনি কাশীখণ্ডের কাহিনী বলতে শুরু করেন—

একদিন দেবতা গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ কাশীতে এসে জগৎপিতা বিশ্বেশ্বরের পুজো করছেন, এমন সময় সহসা ঈশান নামে জনৈক গণপতির খেয়াল হল, বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে কোন জলাশয় নেই। বার বার বহুদূর থেকে জল এনে বিশ্বনাথকে স্নান করাতে হয়।

তখন তিনি মন্দিরের অনতিদূরে ত্রিশূল দিয়ে একটি কূপ খনন করলেন। তারপরে তীর মেরে পাতাল থেকে জল নিয়ে এলেন। হাজার কলসী জল দিয়ে বাবা বিশ্বনাথকে স্নান করানো হল।

তাঁদের সেবায় তুষ্ট হয়ে ভক্তের ভগবান ভোলানাথ বর দিতে চাইলেন। গণপতি তখন করজোড়ে কামনা করলেন, প্রভু! আপনি জগতের পিতা। আপনার সেবার জন্য আমরা যে কূপ খনন করলাম, সেটি আপনার দেওয়া নামে খ্যাত হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠতীর্থরূপে পরিচিত হোক।

করুণাময় নীলকণ্ঠ সেই কূপের নাম রাখলেন জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ। তারপরে বললেন, যে এই কূপের সেবা করবে, সে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হবে।

একবার থামলেন পাণ্ডাজী। কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন—এবারে কাশীখণ্ডের আরেকটা কাহিনী বলছি।

—বেশ বলুন! আমরা ঠিক হয়ে বসি।

পাণ্ডাজী শুরু করেন—একসময় কাশীতে হরিস্বামী নামে একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর একটি যুবতী কন্যা ছিল। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি ভক্তিমতী। তিনি প্রতিদিন জ্ঞানবাপীর সেবা করতেন।

গ্রীষ্মের এক দুপুরে মেয়েটি তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর বাবা কাজে গেছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই। সেই সময়ে বিদ্যাধর নামে জনৈক শিবভক্ত সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথ থেকে তিনি নিদ্রিতা মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। দেখামাত্র তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকে মেয়েটির ঘুম ভাঙালেন।

চোখ মেলে মেয়েটির মনে হল স্বয়ং শিব সামনে দাঁড়িয়ে। মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দুজনেই দুজনকে দেখেন, কারো চোখে পলক পড়ে না।

বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে এসে তাঁরা মালাবদল করলেন। বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী রেখে দুজনে দুজনকে জীবনে গ্রহণ করলেন। তারপরে কাশী থেকে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু সুখে সংসার করা হয়ে উঠল না। দিম্লামালী নামে একজন রাক্ষস একদিন মেয়েটিকে দেখতে পেল। সে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাইল। বিদ্যাধর বাধা দিলেন। দুজনে যুদ্ধ বেধে গেল, ভয়ানক যুদ্ধ। এবং সে যুদ্ধে দুজনেই মারা গেলেন। আর স্বামীহারা মেয়েটিও কাঁদতে কাঁদতে প্রাণত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পরে বিদ্যাধর মলয়কেতু নামে এক রাজার ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল মাল্যকেতু। আর মেয়েটি কর্নাটের রাজার মেয়ে হয়ে জন্মালেন। রাজা তাঁর নাম রাখলেন কলাবতী।

যথাসময়ে মাল্যকেতু রাজা হলেন। তিনি রাজকন্যা কলাবতীকেই বিয়ে করলেন। এ জন্মে তাঁরা সুখে সংসার করতে পারলেন।

কলাবতী বড়ই শিবভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শিবপুজো করতেন। তাঁকে ভক্তিমতী